সে ডাকে আমায়

দৃষ্টিহীন

দেব সাহিত্য কুটীর

উ...

প...

হা...

র.......................................

সে ডাকে আমায়

আজ বহুদিন পরে তাকে আবার দেখা গেল। অধ্যাপকের আসনেও নয়, কোনও সংগীত-সম্মিলনীর মঞ্চতেও নয়, দেখা গেল অতি পরিচিত ধর্মতলার একজন মানসিক রোগ চিকিৎসা-বিশারদের চেম্বারে। ভুল বুঝবেন না, যারাই এখানে আসে, তারাই কিছু পাগল নয়। কথায় কথায় খামকা রেগে গিয়ে, হাতের কাছে যা কিছু পেল, তাই আপনাকে ছুড়ে মারবে না, অথবা আপনাকে দেখামাত্র ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেও শুরু করবে না। জানাবে না দুঃখের কাহিনী, জানাবে না মনের কোনও কথা। অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতনই তাদের চালচলন, কথাবার্তা। এতটুকু বেঠিক নয়। তবুও তারা আসে কেন এখানে? সাইকোলজিস্টকে কি তারা ভালবাসে? মুঠো মুঠো টাকা তার হাতে তুলে না দিলেই কি নয়? এ প্রশ্ন আপনাদের মতন আমারও মনে হয়েছিল একদিন। রুগীদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, পেয়েছি নানারকম উত্তর। কেউ কেউ বলেছেন—ডাক্তারবাবু আমাকে সারিয়ে দেবেন।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছি—কি হয়েছে আপনার?

উত্তর এসেছে—কি না হয়েছে? এককথায় কি সে কথা বলা যায়?

আবার কেউ বলেছেন অদ্ভুত রোগের কথা, যা কোনও ফিজিসিয়ান সারাতে পারেননি।

একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছি—কাকে কাকে দেখিয়েছেন?

উত্তর পেয়েছি—বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে নিম্নতম সেই সমস্ত ডাক্তারের নাম, যাঁরা সবে এম. বি., বি. এস. পাস করে বেরিয়েছেন।

মনে হলো এও কি কখনও সম্ভব? যে ডাক্তাররা এঁকে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা কেউ রোগ সারাতে পারেননি? বোধ হয় ভদ্রলোক কোনও ওষুধই খাননি।

তাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছি—আপনি ডাক্তারদের ওষুধ খেয়েছিলেন?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়েছি—খাব কি করে? আমার রোগের সঙ্গে ওষুধের কাগজগুলো তো মেলে না।

—মেলে না!—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—ওষুধের কাগজ বলতে কি বলছেন?

—ওষুধের কাগজ বলতে আমি বলছি—ওষুধের সঙ্গে যে বিজ্ঞাপনগুলো থাকে।

বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক ওষুধের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিজের অসুখ মিলিয়ে দেখেন। ঠিক না মিললে খান না।

এইবারে প্রশ্ন করলাম—ডাক্তারবাবুরা পুরিয়া, মিক্সচার কিছু দেননি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম—সর্বনাশ, আপনি বলেন কি মশাই? যদি ভুল করে ডাক্তার তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়, তা হলে?

তাঁকে মনের জোর দেবার জন্যে বলি—তার জন্যে পুলিস আছে!

—পুলিস থেকেই বা কি করবে? একবার যদি আমি বিষ খেয়ে ফেলি, ডাক্তারকে তো পুলিস ধরবে আমার মরার পর।

তার আগে তো আর ধরতে পারছে না! তাও যদি আমার শরীরকে পোস্ট-মর্টেম করা হয়।

আর একজন লোককে প্রায় আসতে দেখতাম সেখানে। প্যান্ট-কোট-পরা, দিব্যি ভদ্রলোক। দামী সেণ্টের গন্ধে চতুর্দিক ভরপুর। নিজেই একটা স্টুডিবেকার চাম্পিয়ান ড্রাইভ করে আসতেন। অদম্য কৌতূহল হল,—এ ভদ্রলোকেরই বা কি হয়েছে? কেনই বা ইনি রোজ রোজ এখানে আসেন? সাইকোলজিস্টের ওয়েটিং-রুমে যখন ইনি বসে থাকেন, তখন তো তাঁকে কোনওরকম বেসামাল দেখিনি। অন্যমনস্ক হয়ে কখনও এদিক ওদিক চাইতেও লক্ষ্য করিনি। হয় দেখেছি তিনি কিছু পড়ছেন, না হয় পকেট থেকে নোটবুক বার করে খসখস করে তাতে লিখে যাচ্ছেন। কৌতূহলের বশে লুকিয়ে থেকেও দেখেছি। ইংরেজীতে কোথাও এতটুকু ভুল নেই। ভদ্রলোককে প্রশ্ন করেছি—আপনি কি করেন?

—আমি? ইংরেজী বঙ্গবাণীর এডিটার।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

—আপনি এক বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক, আপনি এখানে?

ভদ্রলোক এক লহমায় আমার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। তার পরে যা জবাব দিলেন তার অর্থ হল এই - দেখুন! আমি কি কারণে আসি তা আপনাকে বলতে পারি। আপনি আবার সে কথা কাউকে জানাবেন না তো? অফিসে জানাজানি হলে আমার আবার একটা লজ্জার কারণ হবে।

আমি বলি—না না, আমার কি প্রয়োজন, কেবল কৌতূহলবশে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

তিনি বলেন—অদ্ভুত একটা ভয় আমার মনের মধ্যে আছে। যখনই ট্রেনে চড়ি তখনই আমার মনে হয় ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট হবে। আপনি জানেন, ক্যালকাটা, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ সব জায়গাতেই

আমাদের অফিস আছে। কাজের তাগিদে অনবরত আমাকে সেখানে যেতেও হয়। সব সময় কোম্পানি প্লেন ভাড়া দিতে পারে না তাই—

আমি ভদ্রলোককে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রশ্ন করি—প্লেনে যেতে ভয় করে না?

—নাঃ, প্লেনে যেতে আবার ভয় কি?

আমি বলি—ক্রাশ্ তো করতে পারে!

—মানুষ মরে একবারই।

কথা বাড়াই না। বৃদ্ধ ডক্টর ঘোষ যদি আবার জানতে পারেন আমি তাঁর চেম্বারে বসে তাঁরই রুগীদের কথা জানবার চেষ্টা করছি, তার জন্যে বিরক্ত হতে পারেন। দরকার কি আমার ক্ষেপিয়ে!

আজ বিশ বছর ধরে এই ধরনের কত রুগীকে আসা-যাওয়া করতে দেখলাম। স্রেফ্ আমার অভিজ্ঞতা যদি বর্ণনা করি, তাতেই হয়তো এক একজনকে নিয়ে এক একটা বই লেখা যায়। তার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার লেখার মধ্যে অনেক কিছু ভুল থাকতে পারে। সে সব লেখবার জন্যে মনের অভিজ্ঞ ডাক্তাররা আছেন।

যাক, যে কথা বলছিলাম।

আজ সন্ধ্যেবেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে অভ্যাসমতই দোতলার ঘরে বসে ছিলাম। নীচেই ডাক্তার ঘোষের চেম্বার। চা খেতে খেতে অলস চোখে খোলা জানলা দিয়ে নীচের দিকে চাইতেই যে জিনিসটা আমার চোখে পড়ে গেল তা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কোলকাতার বিখ্যাত নিরঞ্জন রায়কে তার বিরাট গাড়িটা থেকে একজন হাত ধরে নামাচ্ছে। এ দৃশ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জন্মের কিছু পরেই শৈশবেই নিরঞ্জন দৃষ্টি হারিয়েছিল। তাকে হাত ধরে নামাবে, এ আর বেশী কথা কি! মনে প্রশ্ন এলো, এখানে নিরঞ্জন কেন আসবে? নীচে তো ভাল দোকানও নেই!

পরমুহূর্তে আমাকে বিস্মিত করে তার সহচর ডাঃ ঘোষের চেম্বারের দিকে হাত ধরে এগিয়ে এলো। এখানে তার কি প্রয়োজন হতে পারে, ভাবতে ভাবতে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসি। দোতলার সিঁড়িটা ঠিক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরলে ডাঃ ঘোষের চেম্বার পরিষ্কার দেখা যায়। ওয়েটিং-রুমে উঁকি মেরে দেখি, ওপর থেকে দেখতে আমার ভুল হয়নি। একবার ভাবলাম, পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কি। পরমুহূর্তেই মনে হলো, থাক কাজটা বোধ হয় শোভন হবে না। এখানে আমার পরিচয় পেলেও হয়তো লজ্জাই পাবে। আসল কারণটাই হয়তো বলবে না। তাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জনকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

মনে হলো বয়সের তুলনায় সে যেন অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সামনের চুল উঠে গেছে বলে নিরঞ্জনের ছোট কপাল আজ বেশী চওড়া দেখাচ্ছে। পেছনে ফাঁক ফাঁক যে ক'গাছা চুল আছে তাও সাদা। ইলেকট্রিক লাইটের আলোয় সে ক'গাছা চুলও চকচক করছে। পরনের পাঞ্জাবি আর ধুতিটাও আধময়লা। এ বেশ নিরঞ্জনের স্বভাববিরুদ্ধ; কোথাও যেতে হলে ধোপদোরস্ত কাপড় আর ইস্ত্রি-করা গরদের পাঞ্জাবি নইলে তার চলতোই না। তা ছাড়া পাঞ্জাবির ওপরে সিল্কের চাদরটাও তার ফেলে রাখা চাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম, নিরঞ্জনের গায়ে উঠেছে আদ্দির পাঞ্জাবি। কাঁধেও চাদর নেই। সদাহাস্যময় নিরঞ্জনের মুখ কেমন যেন বিরক্তিমাখানো। কপালে অনেকগুলি বার্ধক্যের রেখা। তবে কি সম্প্রতি নিরঞ্জনের অর্থাভাব ঘটেছে! তা তো ঘটবার কথা নয়! তেমন কথা ওর ম্যানেজার আমার দাদার মুখ থেকেও তো শুনিনি। বড়লোকের ছেলে সে, প্রচুর অর্থও সে জীবনে রোজগার করেছে। এই তো পাঁচ মাস আগে কর্পোরেশনের অ্যাসেসমেন্টের সময়

নিরঞ্জনের ওয়ার্ডের ভার পড়েছিল আমার ওপর। তখনও নিরঞ্জনের যা সম্পত্তি দেখেছিলাম, তার বাজার-দাম পোনেরো ষোল লাখ টাকার নীচে হবে না। নিরঞ্জনের বসতবাড়িটারই বা দাম কত! অতবড় বাড়িতে সে আর তার মা থাকতো। নিরঞ্জনকে প্রশ্ন করেছিলাম—বাড়িটা ভাড়া দাও না কেন নিরু? বেশ কিছু পেতে পার তো।

হেসে সে উত্তর দিয়েছিল—তা হয়তো পারি। কিন্তু বাপ পিতামহ ভাড়া দিলে না যে বাড়ি, সেই বাড়ি আমি ভাড়া দেব! তাই কি ঠিক হবে? সেই নিরুর ষোল লাখ টাকার সম্পত্তি ভোজবাজির মত রাতারাতি উড়ে গেল! সে কথা যেন বিশ্বাস করতে মন চাইলো না। তবে কি হলো তার! নিজের মনে এই রকম নানা প্রশ্ন আর উত্তর ভাবতে ভাবতে আমি আবার ওপরে নিজের ঘরে উঠে এলাম। চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে একেবারে জানলার ধারে গিয়ে বসলাম। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তার গাড়িটার ওপর।

এর পর কতবার নিরঞ্জনকে সেখানে আসতে দেখেছি, ডাক্তার ঘোষের কাছে। কিন্তু আমার কোনও প্রশ্নের সদুত্তর পাইনি। যখন পেলাম, তখন নিরঞ্জনকে একটা সহানুভূতির কথা বলবার মতন অবস্থা আমার আর ছিল না। তার পরে আরও মাস দুয়েক সে বেঁচে ছিল। হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার বিছানার ওপর তাকে লক্ষ্য করেছি। জ্ঞান ফেরার আশা করেছি। কিন্তু ফেরেনি। আমারই চোখের সামনে সে তিল তিল করে মৃত্যু বরণ করেছে। বিকারের ঝোঁকে তার চিরআকাঙ্ক্ষিত প্রিয়ার স্পর্শ, স্নেহচুম্বন পাবার জন্য সে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু শূন্যে প্রতিহত হয়ে তা ফিরে এসেছে তারই কাছে। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে ছোট ছেলের মত সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। কিন্তু সে যা চেয়েছিল তা তো পায়নি! এ স্বার্থপর পৃথিবী তার কাছ থেকে নিঙড়ে অনেকখানি নিয়েছে, বিনিময়ে দেয়নি কিছুই। অন্তিম সময়ে

তার সেই প্রাণস্পর্শী হাহাকার দেখে আমারও দুচোখ সজল হয়ে এসেছিল। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না।

নিরঞ্জনের মৃত্যুর পর বার বার মনে হয়েছে, তার বিচিত্র জীবন-কাহিনী আমার না জানলেই হয়তো ছিল ভাল। কারণ তাতে পৃথিবীকে স্নেহময়ী বলে মনে হতো। কিন্তু সে কাহিনী জানার পর এ পৃথিবীকে বড় শূন্য, বড় নীরস বলে মনে হয়েছিল। এমন কি নিজের স্ত্রীর প্রেমনিবেদনে মনে হয়েছে, সে অভিনয় করে চলেছে। ব্যবহারে আন্তরিকতা দেখলে মনে হতো, হয়তো চরম কিছু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এই খেলা। মায়ের স্নেহ দেখলে মনে হতো, রাক্ষসীর মত বুঝি নিজের সন্তানকে সে নিজেই চিবিয়ে খাবে। অথচ বিনিময়ে নিরঞ্জন পৃথিবীকে যা দিয়ে গেল তার দাম তো অল্প নয়! আজও রাস্তায় চলতে ফিরতে দুর্গাপুজো বা ঐ ধরনের কোনও উৎসবে শুনতে পাওয়া যায় অ্যামপ্লিফায়ার রেকর্ডে তার কণ্ঠস্বর। অরগ্যান আর পিয়ানো সহযোগে সে গেয়ে চলেছে—"আজি এ সন্ধ্যায় কে তুমি গো এলে?"

হায়, আমি যে জানি বন্ধু, এ যে কেবল শিল্পীর মর্মবেদনা! কোনও প্রিয়া তোমার জীবনে বিশেষ সন্ধ্যায় তোমাকে প্রেমালিঙ্গনে বন্দী করবার জন্য তো এগিয়ে আসেনি। সে কার দোষ! তোমার ভাগ্যের! না সমস্ত নারীজাতির! আজও আমার বইএর আলমারিটা খুঁজলে তোমারই স্বাক্ষরিত তিন-চারখানা বই পাওয়া যাবে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে যাতে তুমি রেখে গেছ তোমার অপূর্ব কীর্তি। তোমার এই কীর্তিতে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি তুমি পেয়েছ বটে কিন্তু পাওনি তুমি যা চেয়েছিলে। তাছাড়া কানা নিরুর গান শোনবার জন্যে লোকে পাগল, কিন্তু মানুষ নীরুর কাছে এগিয়ে যেতে লোকে কেউই চায়নি। তাই আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে ছিলে তুমি একটি জ্বলন্ত অভিশাপ। সেই অভিশাপের বহ্নি

তোমাকে তিল তিল করে তুষের আগুনের মত পুড়িয়েছে। তাই, এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা ভরা তোমার ব্যর্থ জীবন-কাহিনী তুলে দিলাম পাঠকদের হাতে, যাতে তারা এই কাহিনী পড়ে তোমার জন্যে ক্ষণেকের তরেও দুঃখিত হয়। আর যদি কোনও নারী দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তোমার জীবন-কাহিনীর ওপর ফেলে, তা হলে পরলোকে তোমার অভিশপ্ত আত্মা হয়তো শান্তি পাবে। এই আশায় এই কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করলাম।

*

* *

নিরঞ্জনের কাহিনী জানতে হলে, বা সব কিছু বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে তার পূর্বের ইতিহাস। নিতে হবে তার বংশের পরিচয়। তবে আমরা বুঝতে পারব কেন নিরঞ্জনের জীবন এত পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও হাহাকারে ভরে গেল। কেনই বা নিরু মরবার সময় তার সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিলে দেশের জন্যে। তার ঐ বিশাল বাড়িটা, যা সার্কুলার রোডের পথচারীর বিস্ময় উৎপাদন করে, কেনই বা সেখানে আজ তার উইল অনুযায়ী তৈরী হয়েছে মেটারনিটি ভবন। সে কথা আজ আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি বন্ধু!

হয়তো পাপ তুমি কিছুই করোনি, কিন্তু তোমার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পাপের পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলে তুমি।

সে আজ একশো বছর আগেকার কথা। দেবেশ রায় আর ভবেশ রায় ছিলেন দুই ভাই। বর্তমান বিহারের মানভূম যা বিহারের কাছ থেকে ফিরে পাবার জন্যে বার বার বাঙলা দাবি করছে, তখন তা ছিল বাঙলারই মধ্যে। ভবেশ রায় কোলকাতায়

চাকরির অন্বেষণে এসেছিলেন। কোলকাতার কোনও একটা ইংরেজ সওদাগরী অফিসে সামান্য মাইনেতে চাকরিও করতেন। দেশে দেবেশ রায় চাষবাস দেখাশুনা করতেন। কোনও রকমে কষ্টেস্বষ্টে দিন চলে যেত। এমনি সময় রাজনৈতিক চক্রে শুরু হলো আবর্তন।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেব বন্দী হয়ে এলেন কোলকাতায়। দিনের বেলায় গান-বাজনার আসর চলে। ওদিকে নর্তকী বা গাহিয়ে বাজিয়ের ছদ্মবেশে রাতের বেলায় হতো যাতায়াত বহুলোকের ওয়াজিদ আলি সাহেবের কাছে ইংরেজের চোখ এড়িয়ে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা।

এসব খবর কোম্পানির পুলিসেরা রাখতো না। রাখবার প্রয়োজনও ছিল না প্রথমটা। প্রয়োজন যখন তারা বুঝলো তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

ভবেশ রায় কোলকাতায় থাকেন। এসব রাজনৈতিক চালের মধ্যে যাবারও তাঁর প্রয়োজন ছিল না। কাজের শেষে, অবসর সময়ে কোলকাতার কোনও বিখ্যাত শিল্পীর কাছে তবলা বাজানো শিখতেন। তবলা বাজনায় দক্ষতাও হলো তাঁর। সন্ধ্যার পর দু'একটা গানের আসরে ডাকও পড়তে লাগলো। খুব শিগ্‌গির কোলকাতার একজন সেরা তবলা-বাজিয়ে বলে তিনি খ্যাতি লাভ করলেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত গুণ ছিল তাঁর। কোথাও কোন আসরে বাঈজীর সঙ্গে তাঁকে কখনও তবলা বাজাতে দেখা যেত না।

তিনি বলতেন, এই সংগীতবিদ্যাটা তাঁদের বংশে পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে। তাঁর দাদা দেবেশ রায় যখন মায়ের নাম-গান করেন তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে। অমন বিভোর হয়ে মায়ের নাম-গান করতে আর তিনি কাউকে কোথাও দেখেননি। শেখবার সুযোগ আর সুবিধে পাননি, পেলে কোলকাতার কোনও নামী গাইয়ের চেয়ে তিনি খারাপ গাইতেন না। তাঁর ঠাকুরদা ৺হরিহর

রায় নাকি এই গানেতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি যখন গান গাইতে বসতেন তখন রাগ-রাগিণীর দর্শন পেতেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর এমন অবস্থা হয়, সংসারধর্ম ছেড়ে তিনি মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাস নেন, এবং বাকী জীবনটা হিমালয় গিয়ে রামনাম করে কাটিয়ে দেন। সেখানে তাঁর আশ্রমে দিনরাত সংগীতের চর্চা হতো। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, এর দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। তাঁর গানের খ্যাতি শুনে, দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রাজা মহারাজা নিজেদের সভায় তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, সামান্য টাকার মোহে তিনি তো সে আদর্শ ত্যাগ করতে পারেন না।

ভবেশ রায় আরও বলতেন, কোলকাতার আজকাল বহু শিল্পী তাঁর ঠাকুরদার ছাত্রের ছাত্র। সন্ন্যাসী ঠাকুরদা কোনও ছাত্রের কাছ থেকে একটি কপর্দকও বিদ্যার বিনিময়ে গ্রহণ করতেন না। এমনি সময় ঘটলো একটা ঘটনা।

বেনারসের একজন বিখ্যাত বাঈজী, নাম তাঁর নয়নতারা, কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে যান এলাহাবাদে। দলে দলে সাধু আসছেন, যাচ্ছেন। কারুর দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই। সকলের পদধূলি গ্রহণ করে তিনি নিজের পাপ স্খালন করছেন। স্নানের পর সাধুদের দান করতে করতে যমুনার ধার ধরে এগিয়ে চলেছেন নয়নতারা।

এরই পাশাপাশি ঘটলো আর এক ঘটনা। হরিহর রায় তাঁর পুত্র ভবেশ রায়ের পিতা শংকরকে নিয়ে এসেছেন কুম্ভমেলায়। ভবেশ রায়ের পিতা তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। পিতার কাছে চলছে তাঁর সংগীতের অনুশীলন। রাত্রি বেশ গভীর হয়ে গেছে, আকাশে ফুটে উঠেছে নক্ষত্রের মালা। সারাদিন উপবাস, দান-ধ্যান করে তাঞ্জামে চড়ে নয়নতারা ফিরে যাচ্ছেন শহরের দিকে।

হঠাৎ বেহারাদের থামতে বললেন তিনি। তাঞ্জাম থেকে তিনি কি যেন দেখবার চেষ্টা করলেন।

প্রথমটা মনে হলো তাঁর বুঝি ভুল হয়েছে। পরমুহূর্তে কান পেতে শোনেন—নাঃ ভুল হবার তো নয়। এখনও তো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে জয়জয়ন্তী রাগের চৌতালে আলাপ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কোনও উঁচুদরের শিল্পী তাঁর শিষ্যকে করছেন শিক্ষা-দান। কে ঐ অদ্ভুত শিল্পী! যাঁর কণ্ঠ থেকে রেখাব আর দুই গান্ধারের অদ্ভুত সংমিশ্রণ বেরিয়ে আসছে! নয়নতারা তাঞ্জাম থেকে নেমে পদব্রজেই অগ্রসর হন সুরের সূত্র ধরে।

খানিকটা এদিক ওদিক খোঁজবার পর তাঁর চোখে পড়ে, কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে এক সন্ন্যাসী একটি একুশ বাইশ বছরের ছেলেকে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। নয়নতারা সন্ন্যাসীর গানে কেবল মুগ্ধ নন, স্তম্ভিত। ভুলে গেলেন তিনি শহরে ফেরবার কথা। ভুলে গেলেন তিনি সব কিছু। ভুলে গেলেন তিনি তাঁর গান শোনবার জন্যে দেশের রাজা মহারাজা পাগল। তাঁর একটা বাঁকা কুটিল চাহনি পাবার আশায় বহু লোক জলের মত টাকা খরচ করতে পারে।

ভুলে গেলেন নয়নতারা সব কিছু। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে সেই ধুনিরই একধারে, বহুমূল্য পোশাক পরেই নয়নতারা ধুলোর ওপর বসে পড়লেন। কারুরই কোনও খেয়াল ছিল না। ওদিকে হরিহর রায় আপনমনে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন নিজের পুত্রকে, অপরদিকে নয়নতারা শুনে চলেছেন তা।

এমনি সময় একটা ঘটনায় সকলকারই বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। একটা শক্ত তান বার বার দেখানো সত্ত্বেও ভবেশ রায়ের পিতা কিছুতেই সেটাকে আয়ত্ত করতে পারছেন না। উচ্চগ্রামে, তারার কাছে গিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর কিসে যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসছে। একবার, দুবার, তিনবার। হরিহর রায় এবার বিরক্ত হয়ে পুত্রকে বলেন—

এবারেও যদি তুমি তান ঠিকমত তুলতে না পার, বুঝব তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়েছ। আর, জয়জয়ন্তী সুর আর যার জন্যেই হোক তোমার জন্যে নয়, এ সুর শেখা তোমায় বন্ধ করতে হবে।

পিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে, ভবেশ রায়ের পিতা যেমনি চতুর্থবার তান তুলতে যাবেন, ঠিক সেই সময় শোনা গেল নারীকণ্ঠের মধ্যে সেই তান। পিতা ও পুত্র দুজনেই চমকে ওঠেন সেই সুর শুনে। নয়নতারারও খেয়াল ছিল না, সেখানে তিনি অনাহূত। আকাশের চাঁদ তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে, ধুনির আগুন অনেক আগে নিভে গেছে কাঠের অভাবে।

স্থিরদৃষ্টিতে নয়নতারার দিকে চেয়ে হরিহর রায় প্রশ্ন করলেন—কি চাও এখানে ? কে মা তুমি ?

লজ্জিত নয়নতারা সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলেন—আমি চাই আপনার কৃপা। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্যা করে নিন।

হরিহর রায় গম্ভীরমুখে বলেন—কোনও স্ত্রীলোককে তো আমি শিষ্য করি না মা ! আমি যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

নয়নতারা বলেন—আমি মনে মনে আপনাকে গুরুর পদে বরণ করেছি। আপনার শিষ্য যে তান তুলতে সমর্থ হয়নি, আমি সেই তান তুলে আপনাকে দেখিয়েছি। তবুও কি আপনি দয়া করে আমায় শিক্ষা দেবেন না ?

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে হরিহর রায় বলেন—বল কি ? তুমি পেরেছ বলেই আমাকে তোমায় সংগীত শিক্ষা দিতে হবে ? আমি তোমার সংগীত-প্রতিভার প্রশংসা করতে পারি, তাই বলে কি আমায় তোমার গুরু হতে হবে ?

নয়নতারা কি যে দেখেছিলেন হরিহর রায়ের মধ্যে তা তিনিই জানতেন।

এক এক করে গায়ের সমস্ত হীরে-মুক্তোর গহনা খুলে ফেলে হরিহরের পায়ের কাছে রাখলেন। তার পরে বললেন—আপনি যদি আমাকে শিষ্যা করেন, আপনাকে আরও প্রচুর অর্থ দেব। যা চান তাই দেব। বিনিময়ে কেবল আপনি আমায় সংগীত শিক্ষা দিন।

নয়নতারার কথা শুনে হরিহর রায় হাসির আবেগে ফেটে পড়লেন। পা দিয়ে গহনাগুলি নিভন্ত ধুনির ছাই-এর মধ্যে ঠেলে দিতে দিতে তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করে বলেন—রূপের বেসাতি করে যারা বেড়ায়, সংগীতকে যারা পণ্যদ্রব্যের মত গণ্য করে, তারা চায় আমার এই শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর স্পর্শ। মূর্খেরা জানে না, সংগীতের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। স্বয়ং শিবশম্ভুর মুখ থেকে নির্গত হয়েছে সাধনার এই পথ। একে ওরা চায় রুপোর বাজারে বিক্রি করতে!

পুত্রের দিকে চেয়ে তিনি বলেন—শংকর, ব্রাহ্মমুহূর্ত আগত। এখানে দাঁড়িয়ে টাকা আর রূপের খেলা কি দেখছ? চল আমরা যাই সংগমের স্নানে। আর যাবার আগে বলি—এই স্ত্রীলোকটিকে দেখে রাখ। ভাল করে দেখে রাখ, এ হচ্ছে জীবন্ত যক্ষ্মা। রায় বংশের কোনও ছেলে যদি এর বা এর গর্ভজাত কোনও মেয়ের প্রেমাসক্ত হয়, সেইদিনই জানবে, রায় বংশ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করতে পারে।—কথা শেষ করে পুত্র শংকরের হাত ধরে সেস্থান পরিত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন সংগমের দিকে।

আর লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে জর্জরিত হয়ে নয়নতারা তখন নিজের চুল দু' হাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগলেন। চোখ দিয়ে তাঁর জলের পরিবর্তে বের হতে শুরু হয়েছে আগুন। তখন তাঁর অবস্থা দেখলে কেউই বিশ্বাস করতো না, তিনিই সেই বিখ্যাত বাঈজী নয়নতারা—গানেতে, কুটিল চাহনিতে যিনি বশ করে রেখেছেন দেশের বহু রাজা

মহারাজাকে। আজও ইংরেজ কোম্পানির বড় জলসায় অনেক টাকা মুজরো দিয়ে যাঁর ডাক পড়ে।

আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে প্রথমটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিলেন নয়নতারা। তার পরে পাগলের মত ছুটে গেলেন যমুনার দিকে। যমুনার জল আঁজলা আঁজলা করে মাথায় মুখে ছিটিয়ে দিয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে, যমুনার জলে দাঁড়িয়ে তিনিও করলেন প্রতিজ্ঞা—যেমন করে হোক ঐ সাধুর বংশকে তিনি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেবেন। এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।

*

*   *

এহেন হরিহর রায়ের বংশধর, শংকর রায়ের পুত্র ভবেশ রায় যে কোনও বাঈজীর সঙ্গে তবলা সংগত করবেন না, সে আর বেশী কথা কি!

কে জানে বাবা! কে কার বংশধর! কি হতে গিয়ে কি হয়ে যাবে! তারপর গোটা রায় বংশটা ক্ষয়রোগীর মতন রক্তবমি করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষের দুই ফুসফুসের মতন, তাঁরা তো কেবল দুই ভাই অবস্থিত! তাতে সাধ করে রোগ ধরিয়ে লাভ কি!

আগেই বলেছি কোলকাতার মেটেবুরুজ অঞ্চলে তখন ওয়াজিদ আলি সাহেব বন্দী। শোনা যায় তাঁর সংগীতপ্রীতির কথা। লক্ষ্ণৌতে তিনি যখন তাঁর প্রাসাদে বসে গান শুনছিলেন, এমনি সময় ইংরেজ সরকার নাকি তাঁকে বন্দী করতে যায়। ওয়াজিদ আলি সাহেব নাকি সেই পদস্থ ইংরেজ অফিসারকে হাত তুলে কথা না বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন, যতক্ষণ না গানের

সোম পড়ে ততক্ষণ অরসিকের মত কথা বলে আমায় বিরক্ত করো না। অদ্ভুত ছিল তাঁর মেজাজ, যার তুলনা পাওয়াই ভার। এহেন ওয়াজিদ আলি সাহেবের গানের জলসায় ভবেশ রায় এলেন তবলা বাজাবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে।

ঠিক সন্ধ্যাবেলা গান-বাজনা শুরু হলো। সারেঙ্গীতে শুরু হলো ইমন-কল্যাণের আলাপ। ভবেশ রায় প্রথমে ঢিমা লয়ে পরে দ্রুত লয়ে তবলা লহরা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন।

শাবাশ!—ওয়াজিদ আলি সাহেব বলে ওঠেন তবলা সংগতের পর।

উপস্থিত শিল্পীরা ভবেশ রায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর কিছু পরে সেদিনকার আসর ভেঙে গেল। কিন্তু ভবেশ রায়ের মনে রয়ে গেল তার রেশ।

মাতাল যেমন নতুন মদের ভাঁটির খবর পেলে, কারণে অকারণে সেখান দিয়ে ঘোরাফেরা করে, সুযোগ-সুবিধে পেলে প্রবেশও করে, তার প্রিয় বস্তুকে আস্বাদন করে, ঠিক তেমনি অবস্থা হলো ভবেশ রায়ের। বিনা নিমন্ত্রণে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল মেটিয়াবুরুজের গানের আসরে যাতায়াত শুরু করেন। এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন ঘটলো একটা ঘটনা।

নতুন এক বাঈজী ওয়াজিদ আলি সাহেবের গানের জলসায় নিমন্ত্রিত হয়ে আসে।

সন্ধ্যার পর শুরু হলো তার দরবারী কানাড়া রাগের আলাপ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোলকাতার কোনও তবলচীই তার সঙ্গে ঠেকা দিতে পারলেন না। কেবলই তাল কেটে যায়। বাঈজী রত্না হয় বিরক্ত। ভুরু কুঁচকে সে বলে—আমি দেখছি বাঙলাদেশে বাজিয়ে নেই কোন।

—বাজিয়ে নেই! ভবেশ রায়ের বুকের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। এতক্ষণ তিনি তন্ময় হয়ে গান শুনছিলেন।

আসরের সমস্ত শিল্পী ভবেশ রায়কে তার সঙ্গে তবলা বাজাতে অনুরোধ করে। শেষে স্বয়ং ওয়াজিদ আলি সাহেবও ভবেশ রায়কে অনুরোধ করেন তবলা বাজাতে।

নাঃ, আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। ভবেশ রায় উঠে গিয়ে তবলায় হাত দেন। শাবাশ! গানের রূপ যেন বদলে যায়! সাময়িক-ভাবে ভবেশ রায় যেন ভুলে গেলেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। জড়িয়ে গেলেন তিনি সুরের মায়াজালে।

অদ্ভুত লয়ের জ্ঞান ছিল সেই রত্না বাঈএর। ভবেশ রায়ের অতগুলো তেহাই, শক্ত বোল, কিছুই করতে পারলো না তার। একটা মাত্রাও এদিক ওদিক হলো না।

তিন ঘণ্টা গানের পর রত্না বাঈ থামে। আসরের সকলের অনুরোধে এবার সকলকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠে সে ঠুংরি গান ধরে। এতক্ষণ ভবেশ রায় তবলা বাজানোতেই বিভোর হয়ে ছিলেন। ওড়নাঢাকা মুখ থেকে যে স্বর বের হচ্ছিলো তাতেই তিনি বিভোর হয়ে ছিলেন। বাঈজী এবারে উঠেছে দাঁড়িয়ে, মুখের অনেকখানি ঝাড়ের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওড়নাটা মুখ থেকে খসে পড়েছে বলে। তার কালো চোখ সুন্দর মুখ দেখে ভবেশ রায় তো অবাক্! ভবেশ রায়ের মনে হলো, তার নাচের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সে যেন তাঁকে আহ্বান করছে তার যৌবনের অপরূপ রাসমঞ্চে লীলাবিহারে।

আসরের সকলকে ছেড়ে দিয়ে বাঈজীর দৃষ্টি যেন তাঁরই দিকে নিবদ্ধ। বার বার সে হেনে চলেছে ভ্রুভঙ্গীর কটাক্ষে অমোঘ শরাঘাত! রক্তমাংসে গড়া ভবেশ রায়ের শরীর। সে-কটাক্ষ চাহনিতে তিনি ভুলে গেলেন সব কিছুই। একটা নেশার কুহেলীর মধ্যে তিনি সংগত করে যেতে লাগলেন।

গান শেষ হলো অনেক রাত্রে। এমন কি ওয়াজিদ আলি

সাহেবেরও 'বাহবা', 'বহুত আচ্ছা' শব্দ ভবেশের মনকে স্পর্শও করতে পারলো না। কেবল রত্না বাঈএর দুটি কথা তাঁর কানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো: "বড় ভাল সংগত করেছেন আপনি, আপনার মতন বাজিয়ে তামাম হিন্দুস্থানে মেলা ভার।"

আসর ভেঙে যাওয়ার পর, নবাবের অনুরোধে, রত্না বাঈকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভারও ভবেশ রায় নিলেন। গাড়িতে উঠে তিনি লক্ষ্য করেন, রত্না বাঈএর সঙ্গে আর একজন স্ত্রীলোক, গাড়িতে বসে রয়েছে।

এ ঘটনা নতুন নয়। তখনকার দিনে এ ধরনের বাঈজীর সঙ্গে একজন পরিচারিকা সব সময়েই থাকতো। তার কাজ ছিল বাঈজীর পোশাক বদলি করে দেওয়া এবং গানের সময় তার সুবিধে-অসুবিধের ওপর লক্ষ্য রাখা। তাই এ ব্যাপারে ভবেশ ততটা মনোযোগ দিলেন না।

প্রথমে রত্না বাঈ প্রশ্ন করে—আপনি কার কাছে বাজনা শিখেছেন?

—আমি? লক্ষ্ণৌএর কালু খাঁর কাছে।

—লক্ষ্ণৌএর কালু খাঁ! তাঁর বাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। কোথায় শিখেছিলেন, কোলকাতায়, না লক্ষ্ণৌতে গিয়ে?

ভবেশ বলেন—না। লক্ষ্ণৌতে আর গেলাম কবে? যাবার পয়সাই বা কোথায় পাব? গুরুজী যখন কোলকাতায় ছিলেন, তখন কয়েক বছর তালিম নিতে পেরেছিলাম। সঙ্গে যদি থাকতে পারতাম,—কথাটা শেষ আর করেন না ভবেশ, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

রত্না বাঈ বলে—এ বিদ্যা বহুদিন গুরুর সঙ্গে থেকে শিখতে

হয়। আপনার হাতের ঢং যেরকম তাতে তাঁর কাছে থাকলে আপনিই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হতে পারতেন। তা যান না কেন তাঁর কাছে। তিনি তো এখনও জীবিত।

ভবেশ বলেন—কি করি বলুন, গেলে যে সংসার চলে না। সামান্যমাত্র চাকরি করি, তাতে কোনওরকমে চলে যায়, তাই—এ সব শখ আমাদের মতন গরিবের জন্যে নয়, বড়লোকের জন্যে।

রত্না বাঈ আমতা আমতা করে বলে—মেটেবুরুজে নবাবের কাছে কি আপনি বাঁধা মাইনেতে থাকেন? মুজরোর টাকা নিতে তো আপনাকে দেখলাম না।

রত্না বাঈএর কথায় বিরক্ত হয়ে ভবেশ রায় জবাব দেন—আমরা হতে পারি গরিব, কিন্তু সরস্বতীকে বিক্রি করি না। সন্ধ্যের পর এখানে অনেক উঁচুদরের শিল্পী আসেন। ভালো গান-বাজনা শুনতে পাবো এই আশায় এখানে আসি।

রত্না বাঈ বলে—আমায় মাফ করবেন, কিছু মনে করবেন না আমার কথায়। মুখ্যু মানুষ, লোককে গান শুনিয়ে, নাচ দেখিয়েই আমার চলে। তাই ভাবি উপায়ের একটা পথ থাকা সত্ত্বেও আপনারা কেন এই পথে রোজগার করেন না। যদি কিছু অন্যায় বলে ফেলি, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না।

ভবেশ রায় বলেন—না:, এতে আর মনে করবার কি আছে? তবে গানবাজনা করে টাকা যে নিই না তার আর একটা কারণও আছে। আমাদের এই বংশে টাকা নেওয়া নিষেধও আছে।

বিস্মিত হয়ে রত্না বাঈ বলে—বারণ আছে, তার মানে? বেনারসে কালু খাঁকে তো আমি মুজরো করতে দেখেছি!

এইবার ভবেশ রায় স্মিত হেসে জবাব দেন—কালু খাঁর শিষ্য বটে আমি। কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসী হরিহর রায়ের বংশের মর্যাদা কম নয়। আমাদের মুজরো করা বারণ।

এইবারে হঠাৎ গাড়ির মধ্যে পরিচারিকাটি নড়ে বসলো। অন্ধকারেও ভবেশের মনে হয়, সেই মুখঢাকা স্ত্রীলোকটির ছুরির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার অন্তর ভেদ করে যাচ্ছে। সেই দৃষ্টির সামনে স্থির হয়ে বসে থাকা ভবেশের মত লোকেরও অসহ্য মনে হলো।

নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন রত্না বাঈএর দিকে। ভবেশের পেছনের গাড়ির কাঁচ দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়েছে রত্নার মুখের ওপর। সেই স্বল্পালোকে রত্নার মুখের অনেক রেখাই ভবেশের চোখে ধরা পড়ছে না। তবুও ভবেশের মনে হয়, কোন এক অপূর্ব মোহিনী মূর্তি ধরে রত্না বাঈ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি আর যারই থাক ভবেশের নেই।

সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভবেশ মনেপ্রাণে কেমন একটা দোলা অনুভব করেন। গাড়ি তখন গড়ের মাঠ পার হয়ে গিয়ে সোজা লালবাজারের দিকে এগোতে শুরু করেছে। বাইরে, গাড়ির মধ্যে কোথাও কোনও শব্দ নেই। কেবল সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে শোনা যাচ্ছে নবাবের ঘোড়ার আটজোড়া খুরের খটাখট শব্দ।

নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথমে কথা বলে রত্না বাঈ। —একটা কথা বলছিলাম কি, ভবেশবাবু, শরম লাগছে আপনাকে বলতে। বাঙলা মুল্লুকে আসা অবধি ভাল বাজিয়ে পাইনে বলে রেওয়াজ করতে পারি না। আর আপনি তো জানেন, ঠিকমত রেওয়াজ না করলে কারুর পক্ষেই ভাল করে নাচা বা গান গাওয়া সম্ভব নয়! যদি দয়া করে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে আমি রেওয়াজটা করতে পারি। তাতে কি আপনার কোনও আপত্তি আছে? আপনি আবার টাকা নেন না, তাই—

ভবেশ উত্তরে বলেন—তাতে কি হয়েছে! আমি যাব আপনার

বাড়িতে। আমারও ভাল রেওয়াজ করার সুযোগ হবে। কারণ জানেন তো, তালকানাদের সঙ্গে বাজিয়ে লাভ নেই।

রত্নার রূপ, যৌবন, মিষ্ট কণ্ঠস্বরে তখন ভবেশ রায় উন্মাদ। ভুলে গেলেন তাঁর দাদার কথা, ভুলে গেলেন সংগীত-জগতে তাঁর বংশমর্যাদার কথা। ভুলে গেলেন তিনি তাঁর স্ত্রী ক্ষমার কথা।

লালবাজার ছেড়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো চিৎপুরে একটা বাড়ির সামনে।

রত্না বাঈ বলে—এই বাড়িতেই আমি থাকি। আপনার মত গুণী শিল্পীর পায়ের ধুলো যদি আমার বাড়িতে পড়ে, তা হলে আমি ধন্য হয়ে যাব। আসবেন তো আবার ?

ভবেশ বলেন—নিশ্চয়ই আসব!

পরিচারিকাটি এবার প্রথম কথা বলে—কবে আসবেন বাবুজী ? কাল সন্ধ্যের সময় ? বিদেশ বিভুঁই জায়গা, বন্ধু বলতে এখানে আমাদের কেউ নেই। আপনি যদি আমাদের দেখাশুনোর ভার নেন।

খুশীতে ভরে গিয়ে ভবেশ রায় বলেন—তা তো আসবই, তা তো আসবই।

রত্না বলে—রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন আর বাড়ি গিয়ে কি করবেন। বরং আমার বাড়িতেই বাকী রাতটুকু থেকে গেলে হয় না ?

ভবেশ রায় বলেন—না, না, তার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি। কাল সন্ধ্যের সময় আমি আবার আসব।

সলজ্জভাবে হেসে রত্না বলে—কেন, আপনার স্ত্রী বুঝি রাগ করবেন! ভাগ্যবতী তিনি। আপনার মত গুণী স্বামী পেয়েছেন।

ভবেশ রায় বলেন—তা কেন, তা কেন, আমার স্ত্রী কোলকাতাতেই থাকে না।

—তবে তিনি থাকেন কোথায় ?

—সে থাকে আমার দাদা বৌদির সঙ্গে দেশের বাড়িতে।

—আর কোলকাতায় আপনি একা থাকেন ?

—একরকম তাই। আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়িতে থাকি। কাছেই আমার বাড়ি। আমি বরং কাল সন্ধ্যায় আসব, এখন চলি।

নমস্কার বিনিময়ের পর ভবেশ রায় তাঁর বাড়ির দিকে কোচম্যানকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দেন। উত্তেজনা আর গাড়ির দোলানিতে ভবেশ রায়ের দু' চোখ বুজে আসতে চায়। ভবেশ রায় যতবার চোখ বুজে, পেছনে ঠেস দিয়ে বসতে যান, ততবারই তাঁর চোখের ওপর ভেসে ওঠে রত্না বাঈএর অস্পষ্ট মুখখানা। কানে বাজতে থাকে সেই একটি কথা—কাল আসা চাই। ছোট দুটি কথা, সেই শব্দে ভবেশের মনে, প্রাণে, রক্তে বেজে ওঠে এক অপূর্ব সুর। পাখির কলকণ্ঠের সঙ্গে প্রভাতের সোনালী স্পর্শ সবে লেগেছে গাছপালার ডগায়, স্নানার্থী চলেছে গঙ্গামুখো তবুও সে সব দিকে ভবেশের দৃষ্টি নেই। তাঁর মন চলে গেছে কোন এক মোহিনীলোকে, যেখানে আছেন কেবল তিনি আর তাঁর রত্না বাঈ। সারেঙ্গী আর তবলা। গান আর তার সঙ্গে সংগত।

*

* *

দিনটা কিছুতেই আর কাটতে চায় না ভবেশ রায়ের কাছে। হঠাৎ অকারণে অতি দীর্ঘরূপে সে আজ পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে। চিরকাল দ্রুত-ছোটা অভ্যেস যে পকেট ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটা, সেটাও যেন বাতিকগ্রস্তের মত ধীরে ধীরে চলতে শুরু

করেছে আজ। বার বার তিনি পকেট ঘড়িটার দিকে চাইছেন আর বিরক্তিতে মন তাঁর ভরে যাচ্ছে। সন্ধ্যা যেন আজ হতে চায় না।

এ পৃথিবীতে কিছুই স্থির নয়। তাই দীর্ঘ হলেও ভবেশের দিন স্থায়ী হলো না। বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। কাজ থেকে ফিরে এসে ভবেশ আজ বিশেষরূপে বেশভূষা বদলালেন।

গরদের পাঞ্জাবি, কোঁচানো কাপড়, সিল্কের চাদর কিছুই বাদ পড়লো না। তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় ভবেশ এসে হাজির হলেন রত্না বাঈএর বাড়ির সমানে।

রত্না বাঈ বোধ হয় তাঁরই জন্য বাড়ির বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে নীচের তলায় এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়।

রত্না বাঈএর সঙ্গে যেতে যেতে ভবেশ প্রশ্ন করেন—আজ কোথাও মুজরো নেই ?

হেসে জবাব দেয় রত্না—রোজ রোজ মুজরো থাকলে তো বড়লোক হয়ে যেতুম। তাহলে কি আর দেশ ছেড়ে আমার আর কলকাতায় আসবার দরকার হতো !

এমনি ছোটখাটো কয়েকটা কথা বলতে বলতে তারা এসে পৌঁছোলো রত্না বাঈএর খাস কামরায়। মেঝের ওপর ফরাশ পাতা। এদিকে সেদিকে দু একটা তাকিয়া ছড়ানো। আসবাবপত্র বলতে ঘরের মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। এক জোড়া তবলা, হাতুড়ি, তানপুরা—এমনি দু' একটা টুকিটাকি জিনিস।

ভবেশ রায় বলেন—এখন রেওয়াজ করবেন নাকি ?

রত্না বলে—হ্যাঁ ভবেশবাবু, রেওয়াজ করব বলেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি।—কথা শেষ করে তানপুরাটা সে তুলে নেয় নিজের কোলে। সুর আর পঞ্চম মিলিয়ে নিয়ে সে করে হাম্বীর রাগিণীর আলাপ।

ভবেশও এরই জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবলাটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে, সুর বেঁধে নিলেন। কাল রাত্রে পেশোয়াজ-পরা ওড়না-ঢাকা যে রত্না বাঈকে ভবেশ দেখেছিলেন, আজ যেন সে রত্না বাঈ এ নয়।

সামান্য লাল শাড়িতে তাকে আজকে মানিয়েছে ভাল। জরির ঝকমকে ঘাগরা আর ওড়না রত্না বাঈএর প্রকৃত রূপের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চায়। হেরে গিয়ে গায়ের রংকে তারা চাপা দিয়ে রাখে। ফুটবার সুযোগই তাকে দেয় না।

রত্নার বড় বড় সুর্মাপরা চোখের দৃষ্টি যে কোন্ দিকে নিবদ্ধ তা বোঝবার বুঝি সাধ্যি কারুর নেই। কেবল চোখের তারা দুটো তানের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে চোখের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবেশ সংগত করবেন, না সেই রূপরাশি দু'চোখ দিয়ে পান করবেন! অন্যমনস্কতার ফলে দু'একবার যে তাল কাটলো না তাও নয়। কিন্তু তাতে কোনও লজ্জা নেই আজ আর ভবেশের। মান-অপমানের পালা যেন সব তাঁর শেষ হয়ে গেছে রত্না বাঈএর কাছে। তিনি যে নিজেকে নিঃস্ব করে আত্মসমর্পণ করেছেন।

খেয়াল গানের পর রত্না বাঈ শুরু করলো দেশ রাগিণীতে ভজন গান :

'ম্যায় প্রীতম পেয়ারে
বংশীওয়ালে
আ যা, মেরা রাজা।'

গানের প্রতিটি কথায় ভবেশ রায় নিজের রক্তের মধ্যে এক নতুন স্পন্দন অনুভব করেন। তাঁর মনে হয় বংশীওয়ালার নামে রত্না বাঈ যেন তাঁকেই আহ্বান জানাচ্ছে তার হৃদয়-মন্দিরে। ও কি বিরহিণী রাধার আকুল আকূতি!

গান যখন শেষ হলো তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

তাড়াতাড়ি তবলা জোড়া রেখে ভবেশ উঠে পড়ছিলেন, এমনি সময় রত্না এসে তাঁর ডান হাতটা চেপে ধরে।

—না বাবুজী, না খেয়ে আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না এত রাত্তিরে।

ভবেশ আপত্তি জানান। রত্না চোখে জল এনে বলে—আমি বাঈজী, তাই কি আপনি আমার বাড়ি খাবেন না?

এর পরে আর কথা চলে না, ভবেশকে আবার বসতে হয় ফরাশের ওপর।

রত্না ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে আসে আবার। তারপর ভবেশকে নিয়ে গিয়ে ঢোকে পাশের আর একটা ঘরে। সেখানে মেঝের ওপর দেওয়া হয়েছে দুজনকার খাবার। রত্না বাঈ একরকম জোর করেই ভবেশকে বসিয়ে দেয় আসনের ওপর। তারপর সে নিজে বসে পড়ে অপর একটিতে। আগের রাত্রে দেখা সেই পরিচারিকাটি তাদের খাওয়ার তদারক করতে থাকে। খাওয়া শেষ হলে ভবেশ যখন বিদায় নেন রত্নার বাড়ি থেকে তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

এর পর থেকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভবেশকে দেখা যায় রত্নার বাড়িতে। কোনওদিন গান হয়, কোনওদিন হয় না। যেদিন রত্না কোথাও গান করতে যায় ভবেশকেও সে আসরে দেখা যায় তবলাবাজিয়ে রূপে।

কোলকাতার অনেক বড়লোকই রত্না বাঈএর চেহারা আর গান শুনে তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল। কেবল ভবেশের কথা ভেবেই রত্না তাদের আমল দেয়নি।

এমন সময়ে ভবেশের জীবনে এলো আর এক পরিবর্তন।

ব্যারাকপুরের ছাউনির সেপাই মঙ্গল পাঁড়ে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে

ইংরেজদের বিরুদ্ধে করলো বিদ্রোহ। অবশ্য সে বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজকে বেগ পেতে হলো না। কারণ বিদ্রোহী বলতে সামান্য কয়েকজন সৈনিকই ছিল।

এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা জানতে পারলেন আসন্ন আর এক বিরাট সিপাহী বিদ্রোহের কথা। সুকৌশলে ভারতীয় নেতারা এই বিদ্রোহ তলে তলে প্রস্তুত করে যাচ্ছেন। যে ভারতীয় সৈনিক ইংরাজের রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, তাদেরই তলে তলে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে। ১৮৫৭ সালে ২৩শে জুন ভারতের সর্বত্র একসঙ্গে এই বিদ্রোহ জ্বলে ওঠবার কথা। বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন স্থানে এ কাজ পরিচালনার ভার নিয়েছেন, এবং বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে ওয়াজিদ আলি সাহেবের নামও পড়ে। ব্যাপারটা ভাল করে সরকারের বোধগম্য হওয়ার আগেই, কানপুর মীরাট ও ব্যারাকপুরে খণ্ড খণ্ড সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেল। এই সমস্ত সৈন্যদের বোঝানো হয়েছিল যে এন. ভি. রাইফেলের গুলি, যা ছোঁড়বার আগে দাঁতে কেটে নিতে হয়, তাতে গরু আর শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে। ধর্মনাশের ভয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকেরাই এই বিদ্রোহে করলো যোগদান। ওয়াজিদ আলি সাহেব সম্বন্ধে খবর নিতে গিয়ে ইংরেজ সরকার জানতে পারলেন গাইয়ে বা বাজিয়ে হিসেবে যাঁরা দিনরাত সেখানে যাতায়াত করেন, তাঁরা অনেকেই এই বিদ্রোহের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং সরকারের আদেশে সেই গাইয়ে আর বাজিয়েদের পেছনে লাগলো গুপ্তচর। ভবেশ রায়ও বাদ গেলেন না তার থেকে। ভবেশ রায়ের চাকরি গেল ইংরেজ সরকারের অফিস থেকে। পুলিসের নিত্য হাঙ্গামা, এদিকে বেকার জীবন। ভবেশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবশেষে রত্না বাঈএর পরামর্শে নিজের গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন বসবাস করবার মনস্থ করলেন তিনি।

রত্না বলে, আপনি ভাবছেন কেন বাবুজী, আমাকে সরকার কিছু বলবে না। কারণ আমি বাঈজী। গান গেয়ে পয়সা রোজগার করাই আমার পেশা। আর ক'দিনই বা আমি ওয়াজিদ আলি সাহেবের মজলিশে গেছি। ওরা আমায় কিছু বলবে না। কিন্তু এদিকে আপনাকে ওরা যদি কোনরকমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে পারে, তা হলে কোনও প্রমাণের জন্য ওরা অপেক্ষা করবে না। হয়তো বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়ে আপনাকে ওরা হত্যা করবে। তখন আমার কি হবে? আপনি মারা গেলে আমি কি বাঁচবো!— কথার শেষে রত্নার গলা ভারী হয়ে আসে। দুচার ফোঁটা চোখের জল গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে। রত্নার একরকম পীড়াপীড়িতেই আট বছর পর ভবেশ ফিরে যান নিজের গ্রামে।

*

*　　*

তখনও বিদ্রোহের আগুন একেবারে মিলিয়ে যায়নি ভারতবর্ষ থেকে। খণ্ডিত হলেও এখানে সেখানে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ হচ্ছে। কিন্তু চাকা তখন ঘুরতে শুরু করেছে। ভারতীয় সৈনিকরা ক্রমশঃ হেরে যাচ্ছে ইংরেজের হাতে। এখনকার মত তখন খবরের কাগজের প্রচলন ছিল না। কিন্তু গুজব রটতে এতটুকু দেরি হতো না। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হতো বিরাট বিরাট মুখরোচক সংবাদ। যা আর কিছু না হলেও, বেশির ভাগ গ্রামবাসীকেই ভয়ার্ত করে তুলতো। সুতরাং প্রাণের দায়ে না পড়লে কোনও লোকই গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতো না।

আবার সিপাহীরা যদি নিজেদের আওতার মধ্যে কোনও দুর্বল ইংরেজ পরিবারকে পেত, তা হলে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে

এতটুকু দ্বিধা করতো না। এই রকম দুঃসময়ে একদিন বিকালবেলায় আকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ঝড়। প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলায় ভেঙে পড়তে থাকে কত গাছ, উড়ে যায় কত খোড়োবাড়ির চাল। বার বার আকাশে বিদ্যুৎ হেনে মর্ত্যের মানুষকে যেন কোন অশরীরী দেবতা ভয় দেখাতে চায়। সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি। নতুন জলের গন্ধ পেয়ে ব্যাঙের দল উৎসাহে ডাকতে থাকে। আর মাছের দল ল্যাজের ঝাপটা মেরে শব্দ তুলে পুকুরের জলকে করতে চায় আথালপাথাল।

ঘরের দুয়ার বন্ধ করে সজাগ গৃহস্থ প্রহর গুনতে থাকে মেঘমুক্ত প্রভাতের অপেক্ষায়।

ভবেশ রায় আর দেবেশ রায়, সন্ধ্যার পরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছেন যে যার নিজের ঘরে। ঘুম কারুরই চোখে আসতে চায় না। এমনি সময় সদর দরজায় কারা যেন আঘাত করে। একবার, দুবার, তিনবার—কিন্তু অতি সন্তর্পণে।

প্রথমটা দেবেশ রায় ঝড়ের শব্দ মনে করে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বার বার তিনবার আঘাত শুনে ব্যাপার-টাকে উপেক্ষা না করে তিনি বেরিয়ে আসেন ঘরের বাইরে। নিঃশব্দে ছোট ভাইয়ের ঘরে গিয়ে, তাঁর নাম ধরে ডাক দেন—ভবেশ, ভবেশ!

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন ভবেশ।

—কারা যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে না ভাই!

ভবেশ বলেন—আমিও শব্দটা শুনেছি দাদা।

—কিন্তু কি করা যায় বলতো! যদি বিপন্ন লোক না হয়ে চোর ডাকাত হয়। তা হলে তো সমূহ বিপদ!

দুই ভাইয়ে যখন এমনি কথায় মত্ত, ঠিক এমনি সময় বাইরে

আবার হলো করাঘাত। এবারে শুধু করাঘাত নয়, চাপা কণ্ঠে ইংরেজীতে কে যেন বলে—বাবুজী, দরজা খুলুন, আমরা ভয়ংকর বিপন্ন।

কোলকাতার ইংরেজ অফিসে কাজ করার দরুন ভবেশ রায় কিছু কিছু ইংরেজী বুঝতেন। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন—বোধ হয় কোনও সাহেব। বিপদে পড়ে আমাদের সাহায্য চাইছে। দরজাটা কি খুলে দেব দাদা?

দেবেশ বলেন—যদি ভাল বোঝ তো খুলে দাও।

এর পরে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভবেশ রায় এগিয়ে যান দরজার দিকে। আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি হাতে করে দেবেশ রায় যান ভাইয়ের পিছু পিছু তাঁকে রক্ষা করতে।

উত্তেজনায় তখন আগন্তুকেরা পাগল হয়ে উঠেছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এবারে জোরে জোরে তারা দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে।

দরজার কাছে এসে ভবেশ রায় ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন—আপনারা কে?

জবাব আসে—সে কথা বলবো পরে। আমাদের সঙ্গে দুজন স্ত্রীলোক আছেন। ভয়ে তাঁরা প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। আগে আপনারা দরজা খুলুন। তাঁদের আশ্রয় দিন। পরে সব কথা হবে।

ভবেশ রায় এবার দরজা খুললেন। একরকম হুড়মুড় করেই দুজন ইংরেজ পুরুষ আর দুজন মহিলা ঢুকে পড়লেন বাড়ির মধ্যে। তাঁদের সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে গেছে ভিজে। মহিলা দুজন যে সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন তা তাঁদের ফ্যাকাশে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। দেবেশ রায় তাড়াতাড়ি মহিলা দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান বাড়ির মধ্যে। নিজের স্ত্রী মালতীকে ডেকে মহিলা দুজনের ব্যবস্থার ভার দেন। তারপরে ফিরে আসেন ভবেশ রায়ের কাছে।

ভবেশ রায়ও ততক্ষণে লেগে গেছেন এই বিপন্ন দুজন পুরুষের

শুশ্রূষায়। কথায় কথায় জানা গেল তাঁদের একজনের নাম 'ম্যাকে', অপরের নাম 'স্মিথ'। তাঁরা দুজনেই সৈন্যবিভাগের লোক। সঙ্গে মহিলা দুজন তাঁদেরই স্ত্রী। কোলকাতার বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে ছ'মাস আগে লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁদের আনা হয়েছিল কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। সেখানকার বিদ্রোহ এখন শান্ত হয়ে গেছে, তাই তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন লক্ষ্ণৌএর পথে। সেখানে অনেক ইংরেজ মহিলা আছেন। তাই তাঁদের স্ত্রীদেরও সেখানে থাকতে সুবিধে হবে। লক্ষ্ণৌতে তাঁদের স্ত্রীদের পৌঁছে দিয়ে তাঁরা দুজনেই চলে যাবেন দিল্লীর পথে। কারণ বর্তমান বিদ্রোহী সৈনিকেরা সেখানে জমায়েত হয়ে মোগল বাদশা বাহাদুর শাকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। এই সমস্ত বিদ্রোহী সৈনিকদের শাস্তি দেবার জন্যে সরকার তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

কোলকাতা শহর থেকে তাঁরা নির্বিঘ্নেই এতদূর এসে পৌঁছে-ছিলেন। কিন্তু আজ দুপুরে একদল বিদ্রোহী সেনা তাঁদের খবর পায়। মুখোমুখি আক্রমণ করতে তারা সাহস করেনি। লুকিয়ে থেকে গুলি করে তাঁদের দু' একজন সৈনিককে আর পালকি-বেহারাদের খুন করেছে। মুখোমুখি যুদ্ধ হলে যে কি হতো তার ঠিক নেই। গুলি লেগে ম্যাকের ঘোড়া মারা গেছে। যখন দুপক্ষে গুলি বিনিময় হচ্ছিলো, সেই সময় ঝড় উঠে অন্ধকার করে দেয়। এবং ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে যেখানে পারলো আশ্রয় নেবার জন্য ছুটলো।

যদি রায় ভ্রাতৃদ্বয় এখান থেকে আরও পনেরো মাইল পশ্চিমে যে 'গোরার' ছাউনি রয়েছে সেখানে সাহেব দুজনকে সপরিবারে চুপিসাড়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেন, তা হলে ইংরেজ সরকার তাঁদের এ উপকার চিরদিনই মনে রাখবেন। আর বিদ্রোহ অবসানে রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম বিশ্বস্ত প্রজার তালিকায় লেখা হবে।

দেবেশ রায়ের সম্পত্তি না থাকলে কি হয়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৈষয়িক। এ সব ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি খুলতো সর্বাগ্রে। সাহেবদের বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি ভবেশ রায়কে নিয়ে বসলেন পরামর্শ করতে।

গ্রামের লোক বিরক্ত হবে ইংরেজ পরিবারকে আশ্রয় দিলে, তা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সাহেবদের ওই আশ্বাসবাণী, এই মহিলা দুজন এবং তাঁদের স্বামীদের রক্ষা করলে, একদিন তাঁদের ভাগ্য ফিরতে পারে। তাই দুই ভাই মনে মনে সংকল্প করলেন সে রাত্রে, যে করে হোক, তাঁদের রক্ষা করতেই হবে। কারণ বিপন্নকে রক্ষা করাই হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তা হোক না সে বিধর্মী। হোক না তারা অত্যাচারী সরকার বা দেশের শত্রুপক্ষের লোক।

প্রতিদিনের মত দিন ও সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি কাটলো। পূর্বদিক রাঙা করে সূর্যদেব আকাশপথে উদয় হলেন। এখন আর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে নেই। ছেঁড়া কালো পর্দার মতন মেঘরাশি আকাশের গায়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। আগের রাত্রের বৃষ্টির ফলে নদী নালা পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে। জাল হাতে ছেলের দল বেরিয়ে পড়েছে মাছের সন্ধানে।

দেবেশ রায় বোঝেন কোনও পালকি-বেহারা পাওয়া আজ দুষ্কর। তাছাড়া পালকি বেহারা যোগাড় করতে গেলে কথায় কথায় ব্যাপারটা গ্রামের মধ্যে রটে যাবার সম্ভাবনা আছে। হয়তো কাছেপিঠে বিদ্রোহী সৈনিকের দল সাহেবদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। খবরটা রটে গেলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। একমাত্র উপায় ঘোড়া। রাতে যদি বৃষ্টি না হয় তো প্রথম প্রহরের শেষে বের হলে, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে গোরাদের ছাউনিতে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা সাহেবদের জানাবার জন্য গম্ভীরমুখে

তাঁদের ঘরে প্রবেশ করেন। আদ্দেক হিন্দী আদ্দেক বাঙলায় তিনি সাহেবদের যা বললেন তার অর্থ হলো এই—দেখুন, পালকি-বেহারা পাওয়া একরকম অসম্ভব। মেমসাহেবরা যদি কষ্ট করে ঘোড়ায় চড়তে পারেন তা হলে তাঁদের জন্যে দুটো আর আপনাদের জন্যে দুটো ঘোড়া আমি যোগাড় করে দিতে পারি।

মিঃ স্মিথ বলেন—সেদিন ঝড়ের সময় একরকম অন্ধের মতন আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি। পথঘাট কিছুই দেখা হয়নি। তা ছাড়া তখন আমাদের দলে লোকও অনেক ছিল। এখন যেতে গিয়ে যদি আমরা সিপাহীদের হাতে পড়ি!

একটা আভূমি সেলাম জানিয়ে দেবেশ রায় বলেন—হিন্দুরা অতিথিকে দেবতার চেয়েও শ্রদ্ধা করে। তার নিরাপত্তার জন্য তারা সব কাজ করতেই প্রস্তুত। যতক্ষণ না আপনারা নির্বিঘ্নে ছাউনিতে পৌঁছুচ্ছেন, ততক্ষণ আমাদের এই 'জান' কবুল—কথা শেষ করে দেবেশ রায় নিজের বুকে হাত দেন।

সাহেবেরা এ প্রস্তাব আর অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কারণ, তাঁদের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। কে জানে নেটিভদের মনে কখন কি হয়!

স্থির হলো রাত দশটার সময় সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, ছটা ঘোড়ায় করে তাঁরা যাত্রা করবেন। প্রথম ঘোড়ায় থাকবেন দেবেশ রায়, গৃহকর্তা স্বয়ং। তাঁর ঠিক পিছনেই থাকবেন, মিঃ স্মিথ, বন্দুক হাতে। মাঝখানে মেয়েরা, সব শেষে মিঃ ম্যাকে আর ভবেশ রায়, দলের পেছনের দিকে থেকে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করবেন।

নির্বিঘ্নেই যাত্রা সুসম্পন্ন হলো। সাহেবেরা ছাউনিতে পৌঁছে সেখানকার সেনাপতির সঙ্গে রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেনাপতি খুশী হয়ে আশ্বাস দিয়ে বললেন—রায় ভ্রাতৃদ্বয় যে রাজভক্তির

পরিচয় দিয়েছেন, সরকার তা কোনও দিনই ভুলবে না অবস্থা আয়ত্তে এলেই এর যোগ্য পুরস্কার তাঁরা পাবেন।

কথাবার্তা সেরে সেই রাত্রেই রায় ভ্রাতৃদ্বয় ফিরে আসেন নিজেদের বাড়িতে। কথাটা লোকে জানতে পারলো না। তাই এ বিষয়ে কোনও কানাঘুষাও হলো না। কিন্তু কানাঘুষা শুরু হলো তখন, যখন এক বছর পরে সরকারের কাছ থেকে রায় ভ্রাতৃদ্বয় পেলেন একখানা "সীল"-করা খাম। সীল ভেঙে দেখা গেল, তাতে স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর লিখেছেন—"ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন, অথবা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও ইংরেজ মহিলার সম্মান আর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা রানীর বিশেষ প্রিয় পাত্র।

গত সিপাহী বিদ্রোহে রায় ভ্রাতৃদ্বয় সেনাবিভাগের মিঃ ম্যাকে এবং মিঃ স্মিথের পরিবারকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সৎকার্যের জন্য দুর্গাপুরের নিকট নতুন যে জমি বিলি হইবে তাহাতে রায় ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রায় ১৬ বর্গমাইল জমিদারি দান করিবেন। সুতরাং তাঁহারা যেন সত্বর কলিকাতায় সরকারের সঙ্গে দেখা করিয়া এ ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া লন।—ইতি। ভারত গভর্নার ভাইকাউণ্ট ক্যানিং।"

লর্ড ক্যানিংএর এই চিঠির কথা জানতে পেরে বহুলোকই রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাগ্যকে মনে মনে ঈর্ষাই করতে শুরু করলো।

দেবেশ রায়ের স্ত্রী মালতী দেবী জাঁকিয়ে লক্ষ্মীপূজা করলেন। আর চিঠি পেয়ে রায় ভ্রাতৃদ্বয় এলেন কোলকাতায় জমিদারির সুব্যবস্থা করতে।

*

* *

এর পরে কেটে গেছে আরও দশটি বছর। বর্ধমান থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে আসানসোলের দিকে ঘুরে গেছে, সেইখানেই ইংরেজ সরকার জঙ্গল কেটে বসিয়েছেন নতুন গ্রাম। এই সমস্ত গ্রাম সেই রায় ভ্রাতৃদ্বয়কে ইজারা দেওয়া হয়েছে। রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের কপাল ভাল, জমিদারি হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ সাতটি কয়লার খনি। দু-তিনটি ইংরেজ কোম্পানি কয়লার খনি উপলক্ষে সেখানে ব্যবসাও শুরু করেছে। নজরানা হিসেবে তাঁরা এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে পেয়েছেন প্রচুর টাকা। ইংরেজ সরকার রেলগাড়ির লাইন পাতবার জন্য তাঁদের কাছ থেকে জমি নিয়েছেন মোটা টাকা দিয়ে। ভবেশ রায় কোলকাতার চাকরি দিয়েছেন ছেড়ে। তাই রত্না বাঈএর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আজকাল বিশেষ আর হয় না। জমিদারির কাজে বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে দাদা আর নায়েব-গোমস্তাদের সঙ্গে কাটাতে হয়। ক্বচিৎ কখনও কোলকাতায় এলে তিনি রত্না বাঈএর বাড়িতেই ওঠেন। সবই ঠিক আগেকার মতন আছে, কেবল রত্না বাঈএর বয়স বেশী হওয়ার জন্যেই হোক অথবা যে কোন কারণেই হোক উচ্চাঙ্গের সংগীত লোকে আর শুনতে চায় না। তাই ভবেশ রায়কে মাসে মাসে একটা মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাতে হয় রত্না বাঈএর নামে কোলকাতায়। কারণ রত্না বাঈ প্রথম যৌবনে কোলকাতার বহু বড়লোককে উপেক্ষা করেও, সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতই কেবল ভবেশ রায়কে আঁকড়ে রেখেছিল। সুসময়ে যে ভবেশ রায়ের ছিল বড় আপনার, আজ তার জীবনের ভাটার সময় ভবেশ রায় কি তাকে ত্যাগ করতে পারেন? তাতে যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে।

দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেবেশ রায় আর ভবেশ রায় তিনখানি গ্রাম একত্রিত করে গড়ে তুললেন রায়গঞ্জ শহর। মন্দির, পুকুর, খেলার মাঠ, স্কুল, বিদেশী কোম্পানির সাহেবদের জন্য প্রমোদ উদ্যান, পাকা রাস্তা, বাজার, কিছুরই অভাব ছিল না সে শহরে।

এরই মাঝখানে তৈরী হলো তিনমহলা রায় প্রাসাদ। তারই মাঝে তৈরী হলো রাধামাধবের মন্দির। ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন ভবেশ দেবেশকে এসে বললেন—দেখুন দাদা, জমিদারি পেয়ে অবধি কোনও উৎসবই আমরা করতে পারিনি। তাই আমাদের সঙ্গে প্রজাদের ভালভাবে পরিচয় নেই। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, আমার ইচ্ছে ওই দিন সমস্ত রায়গঞ্জে একটা উৎসবের আয়োজন করি। প্রজারা ওই দিন যেন বিনা খরচায় মন্দিরে প্রসাদ পায়। আর একটা কথা, আমাদের এখানে যে সমস্ত ইংরেজ কোম্পানি খুলেছে তাদেরও নিমন্ত্রণ করি ওই দিন। বাজি পোড়ানো, মেলা, এসব তো থাকবেই।

দেবেশ বলেন—এতে কত খরচ হবে তার একটা মোটামুটি হিসেব করেছ তো?

—তা আপনার হাজার দশেকের নীচে নয়।

—কোলকাতা থেকে দু'-একজন গায়ককে আনা যায় না?

ভবেশ যেন এই প্রত্যাশাই করেছিলেন। উৎসাহের সঙ্গে তিনি বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই আছে, তা ছাড়া, রম্ভা বাঈ তো আমার পরিচিতই।

—কে রম্ভা বাঈ?—দেবেশ প্রশ্ন করেন।

—কোলকাতার বিখ্যাত বাঈজী।

একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে দেবেশ বলেন—এসব বাঈজীকে আনবে? তাতে কি ফল ভাল হবে? প্রজারাই বা কি ভাববে?

ভবেশ বলেন—দেখুন, তা ঠিক নয়, বড়লোকের বাড়ির উৎসব, তাতে বাঈজী না থাকলে মানাবে কি? এ ছাড়া আপনি কোম্পানির সাহেবদের নেমন্তন্ন করছেন। আমিও চেষ্টা করব বাঙলার লাটকে কোনওরকমে যদি আনতে পারি। সে ক্ষেত্রে বাঈজী না থাকলে ওরা যে আমাদের গেঁইয়া ভাববে।

দেবেশ কেবল একটা 'হুঁ' বলে কথার শেষ করেন।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। ভবেশ কোলকাতায় গিয়ে সাহেবদের জন্য খাঁটি বিলাতী লালপানিও পেটি পেটি পাঠালেন।

কার্জেন, শংকরী, রত্না বাঈ সকলেই আমন্ত্রিত হলো। শেষবেশ বাঙলার গভর্নার বাহাদুর এক রাত্তিরের জন্য রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেও স্বীকার করলেন।

অপরদিকে রায় বংশের দুটি বধূ, মালতী আর ক্ষমা, দুজনেই ছিলেন নিঃসন্তান। এরই মধ্যে ক্ষমা দেবী মালতী দেবীকে জানিয়েছেন রায় বংশের ভাবী উত্তরাধিকারীর আগমনের সংবাদ। আপনভোলা মালতী দেবী ছোটজায়ের এই সুসংবাদটা যখন রাত্রে দেবেশ রায়ের কানে তুলেছিলেন, তখন দেবেশ রায় সংবাদটা শুনে খুশী হয়েছিলেন কি না তা মুখ দেখে বোঝা যায়নি। প্রত্যুত্তরে স্ত্রীকে কেবল তিনি বলেছিলেন, তোমার তো আর কিছু হলো না বড়বৌ।

সরলপ্রাণা মালতী দেবী বলেন—নাই বা হলো। ছোটবোয়ের ছেলে কি আমার পর? সে কি আমার কেউ নয়?

হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দেবেশ বলেন—নাঃ এবার দেখছি আমাকে আবার বুড়ো বয়েসে ফের বিয়ে করতে হবে। ছেলেই যখন হলো না তখন বউ কিসের জন্যে।

সে রাত্রে মালতী দেবী স্বামীর কথাটা পরিহাস মনে করে হাসতে হাসতে স্বামীর বুকে ঢলে পড়ে বলেছিলেন—আমাকে ছেড়ে অন্য মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারবে?

দেবেশ বলেন—খুব পারব। আমারও তো বংশ রক্ষে করতে হবে! নইলে ভবিষ্যতে পিণ্ডির অভাবে স্বর্গে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে যে! এক ফোঁটা জলের জন্যে শেষকালে কি তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরব!

মালতী বলেন—কেন, ছোটবোয়ের ছেলে আমাদের পিণ্ডি দেবে। তা হলে কি হবে না?

দেবেশ বলেন—সাধে কি আর মেয়েছেলের মোটাবুদ্ধি বলে! ছাগল দিয়ে যদি ধান মাড়াই হতো, তা হলে লোকে কি আর গরু কিনতো! সে আমাদের পিণ্ডি দেবে না ছাই দেবে! জ্যাঠার বিষয় পাবার জন্যে যা করতে হয় তাই করবে। থাক সে সব শাস্ত্রের কথা, তুমি মেয়েছেলে—বুঝবে না।

এইখানে বলে রাখা কর্তব্য দেবেশ রায়কে কেউ কখনও শাস্ত্র পড়তে দেখেনি। উপক্রমণিকাটাও তিনি যে পড়েছেন এমন কথাও আমাদের জানা নেই। সংসারের কাজ, আর বাপ শংকর রায়ের কাছে শেখা গান ছাড়া বইএর পাতা ওলটানোর কথা কেউ কখনও শোনেনি।

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এসে পড়লো। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরও আসা শুরু হয়ে গেল।

দেবেশ রায় ঠিক করেছিলেন, উৎসবটা যখন ভবেশের ইচ্ছেতেই হচ্ছে, তখন তাঁরই হিসাবের খাতায় বেশী খরচটাই জমা করবেন। চালাক লোক, আগেভাগে এ কথাটা বলে দিয়ে উৎসবের সময় একটা গোলমাল সৃষ্টি করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

এলো কোলকাতা থেকে রত্না, কার্জেন আর শংকরী। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এলো আলাদা সারেঙ্গী আর সংগতদার। ভবেশ এ ক'দিন ওদের নিয়ে রইলেন ব্যস্ত। দেবেশ অবশ্য ওদিকটায় একেবারেই বিশেষ যাননি। একে ছেলেছোকরার ব্যাপার তার ওপর এই বাঈজীদের নিমন্ত্রণ করায় তাঁর বিশেষ মত ছিল না।

উৎসবের দিন এসে পড়লো। রায়গঞ্জে আর লোক ধরে না। ঢোল পিটে ক'দিন আগে থেকেই সমস্ত প্রজাদের জমিদাররা নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দেবেশ কাশী থেকে দু'জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছেন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মন্দিরের মধ্যে চলেছে তারই প্রস্তুতি আরও কয়েকজন এদেশীয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। হোম, যাগ, যজ্ঞ, পাঠ, কিছুই বাদ পড়েনি। ওদিকে নাটমন্দিরের উঠোনটাকে ঘিরে বসেছে ভোগ রাঁধার আয়োজন। রায় বংশের বড় বধূ মালতী দেবী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তা করছেন তত্ত্বাবধান। মন্দিরের বাইরে কোথাও বসেছে মেলা। নাগরদোলা, জাদুর খেলা, কিছুই বাদ পড়েনি। দোকানদাররা তাদের ঝাঁপ খুলে নানারকম জিনিস নিয়ে বসেছে। তেলেভাজা আর পাঁপড়ের গন্ধে চতুর্দিক ভরপুর। প্রজাদের সকলের মুখেই ফুটেছে হাসি। কেউ জিনিস কিনছে, কেউ বা ছেলেপুলে নিয়ে নাগরদোলা চড়ছে। মেয়েরা এগিয়ে এসেছে জমিদারগিন্নীকে কুটনো কোটায় সাহায্য করতে। পেছনে মাঠটা ঘিরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করছে কর্মচারী আর আমলার দল। এই সমস্তই সকাল থেকে তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন দেবেশ।

মুখ তাঁর আজ আর প্রসন্ন নয়। ভুরুযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত। তবে কারুর সঙ্গেই তিনি রাগারাগি করছেন না। সকলকার সঙ্গেই সাধারণ ভদ্রতাটুকু বাঁচিয়ে যতখানি মেশা সম্ভব ততখানি তিনি করে চলেছেন।

এ তল্লাটে ভবেশ রায়ের কোনও চিহ্ন নেই। সাহেবদের জন্যে সংরক্ষিত রায়েদের বিশাল বাগানবাড়িটা আজ ক'দিন ধরে খেটেখুটে নিজের মনের মত করে সাজিয়েছেন। কোলকাতা থেকে আনা বিলিতী হোটেলের বাবুর্চীরা সেখানে রান্না চাপিয়েছে। সাহেবদের পরিতৃপ্ত করা হচ্ছে বিলিতী লাল পানীয় দিয়ে। পাশের

একখানা ছোট্ট বাড়িকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হয়েছে—বাঙলার লাটবাহাদুরের জন্যে।

আজ রায়েদের প্রাসাদ ছেড়ে, তিন চারজন দরোয়ান বন্দুক কাঁধে করে বাড়িটি পাহারা দিচ্ছে। কোলকাতা থেকে একদল পুলিসও এসেছে শান্তিরক্ষা করবার জন্যে। সন্ধ্যার পর লাটবাহাদুর এলেই সেই বাড়িতে বসবে গানের জলসা। তার জন্যে সকাল থেকে ভবেশ রয়েছেন ব্যস্ত। সন্ধ্যার কিছু আগেই লাটবাহাদুর এসে পড়লেন, নিমন্ত্রিত সাহেবেরা পাশের বাড়ি ছেড়ে আসর জমালেন লাটভবনে।

দেবেশ রায়কে ডাকবার জন্য লোক ছুটেছিল। খবর পেয়ে তিনিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে হাজির। বাজি পুড়লো। বিলিতী কনসার্ট সকলকারই মনকে দোলা দিয়ে গেল। এর পরে শুরু হলো সাহেব-মেমের যুগল নৃত্য। কিন্তু তরল পানীয় অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করায় সকলকারই নাচ তেমন ভাল জমলো না। তারপরে শুরু হলো আমাদের দেশীয় কায়দায় খাঁটি গানবাজনা।

রত্না বাঈ যখন আসরে প্রবেশ করলো তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। আসরের বেশির ভাগই লোক তখন মদের নেশায় আচ্ছন্ন। অধিকাংশ শ্রোতারই তখন আর গান-বাজনা শোনবার অবস্থা নেই। লাটবাহাদুর স্বয়ং ঘুমে আচ্ছন্ন। আসরের ঝাড়লণ্ঠনগুলো কেবল নীরবে আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি একটা ঘুমন্ত আসরে রত্না বাঈএর মত উঁচুদরের শিল্পীর না গান গাইবারই কথা।

আসরে নেমেই রত্না বাঈ একবার সকলের দিকে ভাল করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। সে দেখলো মদের গ্লাস আর মদের বোতল সকলের সামনে। মদটুকু গেলাসে ঢেলে খাবার শক্তিটুকুও অনেকের নেই। যাদের আছে তাদের চোখ জবাফুলের মতন হয়েছে লাল। দৃষ্টি আছে কি না ভালো বোঝা যায় না। এদের মধ্যে দেবেশ কেবল তীক্ষ্ণ-চোখে রত্না বাঈএর দিকে চেয়ে আছেন। সে চোখে কি জ্বলন্ত

কামনার আগুন? কে জানে! ভবেশ গিয়ে বসেন তবলার পাশে। পড়ে-থাকা হাতুড়িটা তুলে নিয়ে তিনি ডাইনেতে মারেন চাঁটি।

আসরের অবস্থা দেখে রত্নার মুখে বিরক্তির এতটুকু রেখা ফুটে উঠলো না। এমনি একটা ঘটনা যেন সে প্রত্যাশা করেই এসেছিল।

শুরু হলো গান। বসে নয় দাঁড়িয়ে। সারেঙ্গী আর তবলার ছন্দে ছন্দে, খাম্বাজ রাগিণীতে ছোট ছোট তান তুলে, সকলকার মনে হিল্লোল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলো রত্না বাঈ। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের ঘুম ভেঙে গেল বাহবাধ্বনিতে।

সকলে চোখ মেলে দেখে পেশোয়াজ-পরা অপরূপ পরী-মূর্তি। তার যৌবন দিয়ে সে যেন সকলকে বেঁধে রাখতে চায়। প্রথম ঘন ঘন বাহবাধ্বনি ওঠে চতুর্দিক থেকে। তার পরেই শুরু হয় রত্নার গানের সঙ্গে নাচ।

সমস্ত আসরটা ঘুরে নাচার ফলে, সব শ্রোতাই মনে করে সেই যেন বাঈজীর একান্ত প্রিয়। নূপুরের কিঙ্কিণীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মনে ওঠে এক অভিনব হিল্লোল। তার প্রতিটি পদবিক্ষেপে, হাতের মুদ্রায়, দেহ-ভঙ্গিমার লালিত্যে এমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে যার ফলে শ্রোতারা হয়ে ওঠে সত্যিকারের মাতাল। শিষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে গেল তখনই, যখন দেবেশের সঙ্গে লাটবাহাদুর চলে গেলেন নিজের বিশ্রামকক্ষে।

গেলাস ভাঙলো, বোতল ভাঙলো, সকলেই নিজের আসন ছেড়ে ছুটে যেতে চায় রত্না বাঈকে ধরতে। বেশীদূর আর কেউ অগ্রসর হতে পারে না। পাশের পুরুষকে ধরেই বলে—Don't get nervous, come my sweet, my darling!

শ্রোতাদের অশিষ্ট আচরণ দেখে, ভবেশ রত্নাকে লোক সঙ্গে দিয়ে পেছনের দরজা খুলে বার করে দিলেন। সেদিকে তখন কারুর দৃকপাতই নেই। এ ওকে জড়িয়ে ধরে বলছে—Come my sweet,

my darling! আবার পরমুহূর্তে নিজের ভুল সংশোধন করারও চেষ্টা করছে।

নেশায় বিভোর থাকায় তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। বোতলভাঙা, গেলাসভাঙা কাঁচের টুকরোয় অনেকেরই তখন হাত-পা কেটে একাকার হয়ে গেছে।

*

* *

এই ইংরেজ জাতটার একটা বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে যে অবসর সময়ে মদ খেয়ে মাতামাতি যেমন করে, তেমনি কাজের সময় সব কিছু উপেক্ষা করে তারা কাজের মধ্যে ডুবে যেতেও জানে। কোনও স্মৃতি কাজের সময় এসে তাদের অলস করে দেয় না।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ লোকেরই নেশা ছুটে গেল। তখন তারা বাকী লোকের নেশা ভাঙিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো যে যার জায়গায় ফিরে যাবার জন্যে। তখন তাদের দেখলে মনেও হবে না যে, কালকে রাত্রে এরা রত্না বাঈকে পাবার জন্যে একটা বিশ্রী কাণ্ড করেছে।

ক্রমশঃই বিকেলের মধ্যে বেশির ভাগ মাননীয় অতিথিরাই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বাঈজীরাও নিজেদের সারেঙ্গী আর তবলচীকে নিয়ে চলে গেল কোলকাতার অভিমুখে। যাওয়া হলো না কেবল রত্না বাঈএর। দেবেশ নিজে চিঠি লিখে তাকে জানিয়েছেন আরও কয়েকটা দিন রায়গঞ্জে কাটিয়ে যাবার জন্যে। কারণ সে রাত্রে, সাহেব-দের হুড়োহুড়ি আর বেলেল্লাপনার মধ্যে ভাল করে গান শোনা হয়নি তাঁর। বিশেষ অতিথিদের থাকার জন্য রায়েদের যে বাগানবাড়িটা ঠিক

হয়েছিল, কথা হলো রত্না বাঈ বাকী কটা দিন সেইখানেই কাটাবে। তাই সন্ধ্যের আগে রত্না বাঈ সেখানে দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। ভবেশ রায় দাদার চিঠিখানা যে দেখেননি তা নয়। চিঠিখানার খবর পেয়ে রত্নাকে আরও ক'দিন কাছে পাবার আশায় তিনি মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন—রত্না, দাদা যদি তোমার গান শুনে তোমাকে এখানে থাকতে বলে, তা হলে তুমি কিন্তু গররাজী হয়ো না।

রত্না বলে—আপনি পাগল হয়েছেন বাবুজী। আপনাকে কতদিন কাছে পাইনি! যদি আপনার দাদার দয়ায় আপনাকে কাছে পাই, সে তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু আপনার দাদার কি আমার গান শুনে ভাল লাগবে?

—ভাল লাগবে না?—ভবেশ বলেন—লেগেই গেছে, ও আর দেখতে হবে না। দাদাও তো আমার মতন গান-পাগলা লোক!

প্রসঙ্গটা সেদিন সেইখানেই থেমে গেল। কেবল যাবার সময় ভবেশ বলেন—দেখ রত্না, সেদিন ঝোঁকের মাথায় দাদার সামনেই আমি তবলাটা বাজালাম তোমার সঙ্গে, কাজটা হয়তো খুব ভালো হলো না; ছোটবউ ক্ষমার কানে এ কথাটা না উঠলেই বাঁচি। তা হলে প্যানপ্যানে কান্নায় সারা রাত্তির ঘুমুতে দেবে না। যা হোক দাদাকে যখন গান শোনাবে তখন তোমার নিজের বাজিয়ে যেন তোমার সঙ্গে সংগত করে, আমার সেখানে না থাকাই ভাল।

রত্না চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা সে পরিষ্কার বুঝেছে।

দেবেশ মুগ্ধ হন রত্নার গানে। তাই প্রতি সন্ধ্যায় রত্নার বাগানবাড়িতে তাঁকে দেখা যেত। তিনি কেবল রত্নার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হননি, রত্নার দেহের ওপরও পড়েছিল তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। কাম আর কাঞ্চন এমনই বস্তু যে একটিকে আহ্বান করলে অপরটি অনাহূতভাবেই এসে পড়ে।

কিন্তু দেবেশ চাপা লোক। মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাই ব্যাপারটা রত্না আঁচ করে নিলেও পরিষ্কার করে বুঝতে তার বেশ দেরিই হয়েছিল।

প্রথম প্রথম দেবেশ রত্নার গান শুনতেন শক্ত হয়ে বসে। কিন্তু ক্রমশঃই তাঁর অজ্ঞাতসারে নাচের তালে তালে তাঁর মাথা দুলতে লাগলো। এমনি একদিন গানের পর পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে তিনি উপহার দিলেন রত্না বাঈকে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিয়ে রত্না বাঈও বিস্তার করে তার মায়ার জাল। চোখে জল এনে রত্না বলে—টাকা নিয়ে আমি কি করব বাবুজী, দু'দিন পরে যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবেন তখন আমার কি হবে!

দেবেশ রায়ের রক্তমাংসের শরীর যেন থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তিনি করুণকণ্ঠে বললেন—কেন, কেন রত্না, তোমাকে আমি তাড়িয়ে দেব, কেন বলছ

মায়াকান্নায় ভেঙে পড়ে রত্না বলে—বাবুজী, আমি জানি। আপনার স্ত্রী হতে আমি কোনদিনই পারব না, তবুও এখান থেকে আমি চলে গেলে, আপনাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব। আমি আপনার পায়ে পড়ি বাবুজী, আপনি আমায় কোনওদিন তাড়িয়ে দেবেন না।—কথা শেষ করে ক্রন্দনরতা রত্না তার মুখখানা চেপে ধরে দেবেশের পায়ের ওপর।

দেবেশও সস্নেহে দু'হাতে রত্নাকে তুলে ধরেন। দেবেশের বুকের ওপর নিজের মুখখানা রেখে রত্না বলে—আজ দু'মাসের ওপর আপনাকে দেখেছি। প্রথম যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি, সেইদিন থেকেই আমি মরেছি।

আবেশে রত্নার মুখের ওপর একটা স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়ে দেবেশ বলেন—এতদিন তুমি সে কথা আমাকে বলোনি কেন রত্না?

—আমি যে মেয়েছেলে, আপনাকে বলি কেমন করে সে কথা

জানেন তো মেয়েছেলের বুক ফাটে তো মুখ খোলে না। কিন্তু দোহাই আপনার বাবুজী, আমাকে যদি সত্যি আপনি ভালবাসেন, তা হলে ছোটবাবুকে আপনি যে করে হোক কোলকাতায় পাঠিয়ে দিন।

বিস্মিত দেবেশ প্রশ্ন করেন—কেন বল তো?

—সে অনেক কথা, আপনাকে সে সব কথা বলা যায় না।

দেবেশ মনে মনে চিন্তা করেন, ভবেশ এতটা নীচে নেমে গেছে।

ভবেশের একটা অভ্যাস ছিল কি, সন্ধ্যার পর দেবেশ রত্নার বাড়ি থেকে চলে গেলেই তিনি এসে হাজির হতেন রত্নার বাড়িতে। যদি কোনওদিন গানবাজনার মাঝেই ভবেশ এসে সেখানে উদয় হতেন, তা হলে লুকিয়ে হয় পাশের ঘরে অপেক্ষা করতেন, না হয় বাগানের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকতেন।

ভবেশ লক্ষ্য করেছিলেন, গানবাজনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিনই দেবেশ চলে যেতেন সেখান থেকে।

ওপরে গানবাজনার আওয়াজ নেই। সন্ধ্যের পর খানিকটা বিলিতী মদ গলাধঃকরণ করার ফলে ভবেশের চোখে তখন নেমে এসেছে রঙিন স্বপ্নের আমেজ। তাই কোনও কিছু বিচার বা অনুসন্ধান না করেই ভবেশ গিয়ে উপস্থিত হলেন রত্নার ঘরে।

রত্নাকে চমকে দেবার উদ্দেশ্যেই ঘরের পর্দা ঠেলে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ভবেশ ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি পিছিয়ে এলেন ঘরের বাইরে। ঝাড়লণ্ঠনের ম্লান আলোতে যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো তার জন্যে আর যে কেউই প্রস্তুত থাক, ভবেশ প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর বড় সাধের রত্না বাঙ্গী লতার মত পড়ে রয়েছে তাঁরই দেবচরিত্র দাদার বুকে। যে দাদাকে তিনি ভালবেসেছেন প্রাণের চেয়েও অধিক। আর রত্নার বিশ্বাসঘাতকতার বোধ হয় শেষ নেই।

মাথায় তাঁর খুন চেপে গেল। তিনি ছুটলেন তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে তাঁর নতুন-কেনা বন্দুকটা আনবার জন্যে।

দেবেশের চোখে ব্যাপারটা না পড়লেও রত্নার চোখে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি দেবেশকে বিদায় দিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে ভবেশের জন্যে। এই রকম কিছু একটা ঘটনা সে যেন আশা করেছিল। তাড়াতাড়ি নিজের গহনাগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অস্থির পদবিক্ষেপে বন্দুকটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে ভবেশ এসে ঢুকলেন রত্নার ঘরে। রত্না এর জন্যে যেন প্রস্তুতই ছিল। নিজের শরীরটাকে স্থির কাঠের মতন করে ফেলে ভবেশের দিকে লক্ষ্য করে সে পড়ে রইলো মাটিতে।

ভবেশ এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বিস্মিত হয়ে গিয়ে ডাকেন—রত্না, কি হলো?

কোনও সাড়া আসে না রত্নার কাছ থেকে। কেবল মাঝে মাঝে শোনা যায় রত্নার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

বন্দুকটা হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন রত্নার দিকে। মাথার ওপর হাত রাখতে রত্না কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে—আমাকে তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বাবুজী, আমি তোমার ছোঁয়ার যোগ্য আর নই। আমি সত্যই আজ পতিতা।

ভবেশ বলেন—কি হয়েছে কি?

আবার কোনও উত্তর না দিয়ে রত্না জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সত্যই ভবেশ ভালবেসেছিলেন রত্নাকে। রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বন্দুক নিয়ে এলেও রত্নার চোখে জল দেখে তাঁর সব রাগ গলে জল হয়ে গেল। ভুলে গেলেন ভবেশ কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যের কথা, ভুলে গেলেন তিনি—রত্না আর যাই হোক, সে পতিতা নারী ভিন্ন আর কিছুই নয়। রত্না ছলনা করে যতই কাঁদে, ভবেশের মনও তত গলে তার চোখের জলে।

ব্যাপারটা খানিকক্ষণের মধ্যে বেশ সহজ হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে,

ভবেশকে আশ্রয় করে রত্না উঠে বসে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে—তোমায় কাছে পাব বলে আমি তোমার দাদাকে গান শোনাতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার এ কি হলো! তুমি তো জান ভবেশ, তোমাকে ছাড়া আমি জীবনে কাউকে ভালবাসি না। তোমার জন্যে কত রাজা মহারাজার নিমন্ত্রণও আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।

ভবেশ বলেন—তা তো জানি রত্না!

—কিন্তু তোমার দাদা, আজ!—

রত্না নির্বাক।

ভবেশ বলেন—বুঝেছি। বলে বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তিনি যেমন অস্থির পদবিক্ষেপে ঢুকেছিলেন ঘরের মধ্যে তেমনি বের হয়ে যান বাড়ি থেকে।

ভবেশ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই রত্না তার বাক্স থেকে বার করে সেই পরিচারিকার ছবিটা। তারপর অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বলে—বল মা, তোমার অপমানের প্রতিশোধ কি নেওয়া হয়েছে? হাত ধরে তুমি যে অনুরোধ আমাকে করে গিয়েছিলে, তা কি আমি রক্ষা করতে পেরেছি? কিন্তু তুমি কি বুঝেছ আমার কি জ্বালা? —কথাটা শেষ করে ছবিটার ওপর মুখ গুঁজে রত্না এবার সত্যই কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে দেবেশ রায় বাইরের কাছারি বাড়িতে যাচ্ছিলেন, এমনি সময়ে ভবেশ তাঁর সামনে এসে বলেন—আজকেই আমি কোলকাতায় যাব।

দেবেশ বললেন—বেশ তো। কিন্তু কেন কোলকাতায় যাবে, তাড়াতাড়িটা কিসের?

ভবেশ কি যেন খানিকটা ভেবে নেন, তারপর বলেন—খাতার জমা-খরচের হিসাব দেখলুম, উৎসবের জন্যে বেশী খরচাটাই আমার নামে লেখা হয়েছে, তার কারণ?

দেবেশ বলেন—কারণ খুব সোজা। তোমার ইচ্ছেতেই উৎসবেতে বাঈজী নাচগান হয়েছে। তাই।

বাঁকা হেসে ভবেশ বলেন—তা হলে রত্না বাঈএর খরচটা কার নামে লেখা হবে? সেও তো আজ দু' মাসের ওপর আছে এখানে। আর তার জন্যেও খরচা কম হয়নি।

দেবেশ বলেন—কী বলতে চাও তুমি?

ভবেশ স্থিরদৃষ্টিতে দেবেশের মুখের দিকে চেয়ে বলেন—আমার যা বলবার ছিল তা আপনার মত লোককে বলতে চাই না।

দেবেশেরও মনটা খুব ভাল ছিল না। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে এই অপমান তাঁর সহ্য হলো না। তাই খানিকটা চেঁচিয়েই তিনি বললেন—তার মানে?

ভবেশ বলেন—তার মানে পরিষ্কার।

শিল্পীদের নিয়মই এই। বহু অপমান তারা গায়ে মেখে হজম করতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, অতি তুচ্ছ কারণে তারা হঠাৎ আত্মবিস্মৃতও হয়। যার মীমাংসা এক সেকেণ্ডে হওয়া উচিত ছিল, গড়িয়ে, ফেঁপে ব্যাপারটা এমন আকার ধারণ করে, যে বছরের পর বছর কেটে গেলেও তার মীমাংসা আর হয় না, তার ফলে বহু শিল্পীর জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ। ভবিষ্যৎ যেন তারা ভাবতেই শেখে না।

তাই সেদিন তুচ্ছ রত্না বাঈকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের জীবনে শুরু হলো তুমুল কলহ। দাস-দাসী, নায়েব-গোমস্তা, সকলেই অন্তরাল থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। খবরটা অন্তঃপুরেও পৌঁছুতে দেরি হলো না। মালতী আর ক্ষমা দুজনেই ছুটে আসে সেখানে। বড় ভাসুরকে কলহরত দেখে ক্ষমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথায় কাপড়টা টেনে দেয় বুক অবধি। ভবেশের রুদ্ধ অভিমান তখন ফেটে পড়েছে। দুই ভাই তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ভবেশ

বলেন—আজ তুমি বড়লোক হয়েছ, তাই আগেকার দুঃখের দিনের কথা ভুলে গেছ। তখন কোলকাতায় থেকে, আমার রোজগারে কি তোমার সংসার চলেনি ?

এতবড় আঘাতের জন্যে বোধ হয় দেবেশ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চেঁচিয়ে বলেন—মিথ্যে চেঁচামেচিতে এ সমস্যার সমাধান হবে না। ইংরেজের আদালত আছে। মামলা করে জমি চুল চিরে ভাগ করে নাও। আর তারপর, আমার ভাগের থেকে, তখনকার দিনে তুমি যত টাকা সাহায্য করেছ, তা সুদে আসলে নিয়ে নিও। এতে যদি আমাকে বড়বৌয়ের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তাতেও আমি দুঃখিত নই। শুধু শুধু চেঁচামেচি করে লোক-হাসাহাসি করে কোনও লাভ নেই। আজ থেকে বুঝবো, কোনওদিনই আমার কোনও ভাই ছিল না।

কথাটা কানে যেতেই মালতী দেবী দু'হাত দিয়ে স্বামীর মুখ চেপে ধরলেন। ভৎ'সনার সুরে বললেন—আঃ কি করছো! বুড়ো বয়সে কি তোমার ভীমরতি হয়েছে ?

সজোরে মালতী দেবীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে দেবেশ বলেন—ভীমরতি হয়নি বড়বৌ! তবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণের ছেলে যদি আমি হই, তা হলে ভবেশের সঙ্গে আমি কখনই এ বাড়িতে থাকব না। তুমি তৈরী হয়ে নাও, আজই আমরা চলে যাব দেশের বাড়িতে।

দেবেশের প্রতিজ্ঞায় ভবেশের সংবিৎ ফিরে আসে। তিনি তখুনি দেবেশের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেন—রায়গঞ্জ আপনি তৈরি করেছেন, আপনি কেন এখান থেকে যাবেন ? তার চেয়ে বরং ছোটবৌকে নিয়ে আজই আমি কোলকাতায় চলে যাচ্ছি।

মালতী দেবী দু'হাতে ভবেশকে তুলে ধরে বলেন—কি বলছ ভাই ঠাকুরপো! একটু চুপ করো না। তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ, ছোটবৌয়ের গর্ভে রয়েছে রায়েদের বংশধর!

ভবেশ মালতী দেবীকে প্রণাম করে বলেন—বৌদি, যতদিন বাঁচবো ততদিন তোমার স্নেহের কথা কোনওদিন ভুলবো না। কিন্তু দেখ, ভাই, আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই কত সহজে আমাকে পর করে দিলে!

*

*   *

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেখানেই অর্থ সেখানেই অনর্থ। সুখ আর শান্তি পাবার আশায় উত্তেজনার বশে মানুষ যা করে বসে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার বিষময় ফল ফলতে দেরি হয় না। আর সেই বিষময় ফলের প্রভাবে তার বাকী জীবনটা অশান্তিতে জর্জরিত হয়ে যায়।

মাত্র দশটি বছর অর্থের প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিলেন এই রায় ভ্রাতৃদ্বয়। সেদিনকার সেই ঝগড়ার পর ছোটবৌ ক্ষমাকে সঙ্গে নিয়ে ভবেশ চলে আসেন কোলকাতায়। শুরু হয় দুই ভায়ের মধ্যে মামলা। আর সব অনর্থের মূল রত্না বাঈকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না।

মামলা মিটলো, জমিদারি দু'ভাগে ভাগ হলো। মিটলো না দেবেশ আর ভবেশের অভিমান। দুই ভাই চান পরস্পরের কাছে গিয়ে আবার সখ্যসূত্রে বাঁধা পড়তে, কিন্তু সখ্যতার একটা সূত্রও কেউ খুঁজে পান না। এমনি সময় ভবেশের স্ত্রী ক্ষমা রায় বংশের উত্তরাধিকারী সুজিতকে প্রসব করেই তাঁর মায়ের কর্তব্য শেষ করলেন। শিশু সুজিতকে তখন মানুষ করে কে? ওদিকে রত্নার শোক ভোলবার জন্য ভবেশ তখন দিনরাত ডুবে আছেন মদে। কারণ

কোলকাতায় না এসে রত্না আবার ফিরে গেছে পশ্চিম মুল্লুকে। তার ঠিকানা যে কি তা ভবেশের জানা ছিল না।

ঝি-চাকরের হাতে সুজিতের ভার পড়লো। এমনি যখন সংসারের অবস্থা, তখন সকালে একদিন ঘুম থেকে উঠে গোলমালের শব্দ শুনে ভবেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন নিজের ঘর থেকে। দেখেন তিনি বছরখানেকের শিশু সুজিত রয়েছে মালতী দেবীর কোলে। তাঁর মুখ-চোখ আনন্দে হয়েছে উদ্ভাসিত।

সুজিতও তাঁর বুকের ওপর পড়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। অপরিচিত বলে কান্না নেই, দুঃখ নেই। ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছে মালতী দেবীর গলা। ভবেশকে দেখতে পেয়ে মালতী দেবী এগিয়ে আসেন সেই দিকে। তাড়াতাড়ি ভবেশ নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেন, তারপরে প্রশ্ন করেন,—কখন এলে বৌদি? একটা খবর দিয়ে এলে ভালো হতো না? আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতাম রায়গঞ্জ থেকে!

মালতী দেবী বলেন—খবর কেন দেব? তুমি যে আমার শত্রুপক্ষ।

ভবেশ পরিহাসের ছলে বলেন—তবে শত্রুর বাড়িতে সকালবেলায় এলে কেন?

গম্ভীর গলায় মালতী দেবী জবাব দেন—এলুম কি আর সাধে! দুই ভাই তোমরা ঝগড়া করলে, ছোটবৌটা চলে গেল, শেষকালে কি বাচ্চাটাকেও মারতে চাও! দুটো নয়, চারটে নয়, রায় বংশেরই শিবরাত্রির সলতে একমাত্র সন্তান মানুষ হবে ঝিয়ের কোলে? আর আমি বেঁচে থাকতে?—কথাগুলি বলতে বলতে মালতী দেবীর দু'চোখ ভরে আসে জলে।

শোকের আবেগ খানিকটা শান্ত হলে তিনি বলেন—আজ ছ-সাত মাসের ওপর তোমার দাদাকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তীর্থে তীর্থে।

রায়গঞ্জের অতবড় বাড়ি আমার যেন আর সহ্য হয় না। তাইতো ঠিক সময় ছোটবৌয়ের মৃত্যুর খবরটাও আমি জানতে পারিনি। আর তোমাকেও বলিহারি, এই খবরটুকু তোমার দাদাকে জানালে তুমি কি মানে ছোট হতে?

ভবেশ অপরাধীর মতন মালতীর দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে মালতী দেবী ফের বলেন—তোমার চেহারা যা দেখছি, আমার তো খুব ভাল বোধ হচ্ছে না। তুমি বরং আজকে আমার সঙ্গে চলো রায়গঞ্জে।

একরকম চমকে উঠে ভবেশ বলেন—না না বৌদি, খোকাকে নিতে এসেছো খোকাকেই নিয়ে যাও। আমি এ মুখ নিয়ে আর দাদার সামনে দাঁড়াতে পারব না। আমি ছোট হয়ে সেদিন—কথাটা আর শেষ করতে পারেন না ভবেশ। উদ্গত অশ্রু তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে।

মালতী দেবী বলেন—যা হয়ে গেছে ঠাকুরপো, তা আর ভেবে কি ফল? তা তো আর ফিরবে না ভাই! তার চেয়ে বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার দাদাকে বলে আবার তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

ভবেশ বলেন—আবার বিয়ে! যে জন্যে এসেছো, তাকেই তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। ওকে মানুষ করে তুলো। আর একটা কথা বৌদি, আমার হয়ে দাদাকে বলো—খোকা যেন কোনও দিন গান-বাজনা না শেখে। এই গান-বাজনার সূত্র ধরেই দাদার সঙ্গে আমার হয়েছে মনোমালিন্য।

মালতী দেবীর শত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও ভবেশ কিছুতেই রায়গঞ্জে যেতে রাজী হলেন না।

এর পরে ভবেশ আর বেশীদিন বাঁচেননি। মদ খাওয়া আর

নানারকম শারীরিক অত্যাচারে তাঁর লিভার পচে যায়, আর তাইতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভবেশের অসুখের খবর পেয়ে দেবেশ এসেছিলেন রায়গঞ্জ থেকে মালতী দেবী আর সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে। শিশু সুজিতকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভবেশ খালি বলেছিলেন—কখনও গান-বাজনা করিসনি। তা হলে আমার মতন সর্বস্বান্ত হতে হবে।

দেবেশ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন—অমন করছিস কেন ভবেশ, আবার তুই সেরে যাবি। ভাল হয়ে উঠে, আবার আমরা দু' ভাই একসঙ্গে রায়গঞ্জে মিলব।

এ কথার উত্তরে ভবেশ কোনও জবাব দেননি। বালিশে মুখ গুঁজে তিনি চোখের জল ফেলছিলেন। খানিকটা শান্ত হতে বলেছিলেন—বেঁচে থেকে কোনও উপকারই আপনার করতে পারলাম না দাদা, কেবল আপনাকে জ্বালিয়ে গেলাম। আমার মৃত্যুর পর দুটো জমিদারি আপনি আবার এক করে নেবেন।—তার পরে আর কোনও কথাই তিনি বলতে পারেননি, পেটের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

অজ্ঞান হয়ে যাবার পরেও ভবেশ বাঁচেন আরও তিনটা দিন। কিন্তু তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসে না। সুজিতকে নিয়ে ক'দিন দেবেশ ভবেশের কোলকাতার বাড়িতেই ছিলেন। তার পরে ফিরে আসেন রায়গঞ্জে।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সুজিতের যখন বয়েস বছর কুড়ি, তখন দেবেশ মারা যান। বিবাহ মালতী দেবী দিয়েছিলেন সুজিতের কোলকাতার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে। বিয়ের পর রায়গঞ্জের বাস তুলে দিয়ে, জেঠীমা আর স্ত্রী নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে সুজিত আসে কোলকাতায়।

সুখের আশায় মালতী দেবী নির্মলার সঙ্গে সুজিতের বিয়ে

দিয়েছিলেন। সংসারে কিন্তু তিনি সুখ পাননি। খুঁটিনাটি নিয়ে পুত্রবধূ নির্মলার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য লেগেই থাকতো। কিন্তু অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন মালতী দেবী। নির্মলার কোনও অপমানই তিনি গায়ে মাখতেন না, সব অপমানই হেসে উড়িয়ে দিতেন। এমনি যখন সংসারের অবস্থা, তখন নির্মলার গর্ভে জন্ম হলো মাধুরী আর তার ভাই নিরঞ্জনের।

নিরঞ্জনের জন্মে রায় পরিবার কোথায় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তা না হয়ে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হলো।

নির্মলা কাঁদলো, বৃদ্ধা মালতী দেবী ঠাকুরঘরে বসে চোখের জল ফেললেন। গৃহদেবতা রাধামাধবকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এ তুমি কি করলে ঠাকুর, এ তো আমি চাইনি।

এ জগতে কিছুই স্থির নয়। তাই রায় পরিবারের শোকাবেগও সহ্য হয়ে গেল সকলকার। আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো সকলকার মুখে হাসি। পৌত্র নিরঞ্জনকে কোলে নিয়ে শিশুর চাঁদপানা অবোধ মুখের দিকে চেয়ে মালতী দেবী হাসতেন। রাধামাধবকে বলতেন,—তুমি কি করুণাময় ঠাকুর, তোমার করুণার শেষ নেই। কি সুন্দর আমার দাদাকে দেখতে। চোখ নেই, নাইবা রইলো! দাদা আমার এমনিতে প্রাণে বেঁচে থাক, ও আমার একাই একশো। মাধুরী আর নিরঞ্জন মালতী দেবীকে আশ্রয় করে বড় হতে থাকে।

নিরঞ্জনের পিতা সুজিতকে আর কেউ কখনও কোনদিন হাসতে দেখেনি। মালতী দেবীর একটা অভ্যাস ছিল, সুজিত যখনই বাড়ির মধ্যে খেতে আসতো তখনই শত কাজ থাকলেও তিনি তা ফেলে রেখে এসে বসতেন তার খাওয়ার কাছে। এ-কথা সে-কথার পর একদিন মালতী দেবী প্রশ্ন করেন—হ্যাঁরে খোকা, তোর মুখ এত গম্ভীর কেন রে? নিরঞ্জনকে তো একদিনও নিতে দেখি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুজিত বলে—মা, ও ছেলেটা থাকার চেয়েও, না থাকলেই বোধ হয় ভাল হতো।

ষাট্—ষাট্ বলে মালতী দেবী কানে হাত দেন। তার পরে সুজিতকে লক্ষ্য করে বলেন—দুটি নয়, তিনটি নয়, দাদু আমার একমাত্র বংশধর। আজ মঙ্গলবার, তুই বাপ হয়ে এমন কথা বল্‌লি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুজিত বলে—হ্যাঁ মা, বললুম, বড় জ্বালায় বলেছি। এখন আমার অহোরাত্র ভাবনা হয়, আমি মলে ওকে দেখবে কে?

ছোটবেলা থেকেই সুজিত মালতীকে মা বলেই ডাকতো।

মালতী দেবী বড় বড় চোখ করে সুজিতের দিকে চেয়ে থাকেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলেন—দ্যাখবার মালিক কি তুই! ছ'মাস বয়েসে যখন তোর মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন কে তোকে দেখেছিল? তোর বাপ তো দিনরাত মদ আর বাঈজী নিয়েই পড়ে থাকতো! আমিও তো তোর জ্যাঠার সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কেউ না দেখলেও যেমন তুই বেঁচেছিস্, তেমনি জানবি আমার দাদুকেও তিনিই দেখবেন।

চোখের জলটা বোধ হয় গোপন করবার জন্যে সুজিত অন্যদিকে চায়। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—জানি সবই মা, তবুও মন বুঝতে চায় না।

নিরঞ্জনের পাছে কোনও অসুবিধা হয়, তাই তাকে মানুষ করবার ভার মালতী দেবী নিজেহাতেই নিয়েছিলেন তুলে। আর নিরঞ্জনও তাঁর বুকের ওপর মুখ রেখে তাঁকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। তাকে বুকে চেপে ধরে মালতী দেবী মাঝে মাঝে বলতেন, দাদু আমার বুড়ো বয়সে হরিনাম ভুলিয়েছে। ওকি আমার কম শত্রু!

ওকে এক মিনিট চোখের আড়াল করলে আমার যে জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে যাবে।

অপর দিকে নির্মলা ছিল বড়লোকের মেয়ে আর বড়লোকের স্ত্রী। ছেলেকে জন্ম দিয়েই তার দায়িত্ব খালাস। তার ওপর নিরঞ্জন ছিল দৃষ্টিহীন। সেই জন্যেই হোক, অথবা সদাসর্বদা মালতী দেবী তাকে ঘিরে থাকার জন্যেই হোক, নিরঞ্জনের ওপর সে বেশী দৃষ্টি দেয়নি, দিতে চাইতোও না। মেয়ে মাধুরীকে সাজিয়েগুজিয়েই সে আনন্দ পেত।

বাপেরবাড়ি বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যখন সে নেমন্তন্ন রাখতে যেত, তখন কন্যা মাধুরীই তার সঙ্গে যেত। তার ওপর তার মেজাজটা ছিল সামান্য রুক্ষ। কোন কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতো। তাই নিরঞ্জনও তাকে যথাসাধ্য এড়িয়েই চলতো। তার যত আবদার ছিল ঠাকুমার কাছে। এমনি এক সময়ে নিরঞ্জন শুনতে পেল, মাধুরী নাকি স্কুলে ভরতি হয়েছে। রুদ্ধ অভিমানে সে ফেটে পড়লো।

বাবা দিদিকে স্কুলে ভরতি করে দিল, তাকে দিল না কেন? তাই সে নালিশ জানাতে গেল ঠাকুমার কাছে। কিন্তু শিশু নিরঞ্জন আশ্চর্য হয়ে গেল ব্যাপারখানা দেখে। অন্যদিন বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, মালতী দেবীর মুখ থেকে সে একটি কথাই শুনতে অভ্যস্ত ছিল—"আসুক খোকা আজ বাড়িতে, তাকে খুব বকে দেব"। কিন্তু আজ ঘটলো তার ব্যতিক্রম। উত্তরের পরিবর্তে মালতী দেবীর চোখে যে জল এসেছিল নিরঞ্জন তা স্পষ্ট অনুভব করলো।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে ধরাগলায় মালতী দেবী বললেন—তুমি কি করে লেখাপড়া শিখবে দাদু, তুমি যে দেখতে পাওনা।

নিরঞ্জন চমকে উঠলো। 'দেখতে পাও না' মানে! কথাটা মুখে আর সে প্রকাশ করল না। সেখান থেকে চলে এসে দালানের ওপর

ঘুরপাক খেতে খেতে সে বার বার চিন্তা করতে লাগলো, দেখতে না পাওয়ার অর্থ।

দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে—দেখতে-পাওয়া কি, ঠাকুমা ?

মালতী দেবী বলেন—আমাদের চোখ ভাল আছে, আমরা চোখ দিয়ে অনেক দূর থেকে মানুষকে দেখতে পাই, চিনতেও পারি।

হাত দিয়ে দেখা বা কান দিয়ে শোনার দরকার নেই,—নিরঞ্জনের কাছে ভারী আশ্চর্য মনে হলো। ঠাকুমার কথার প্রতিবাদ সে করলো না বটে কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলো, এও কি আবার সম্ভব !

বিকেলে মাধুরী স্কুল থেকে ফিরে এলে, নিত্যকালের মত দুই ভাই বোন ঠাকুমার কাছে বসে খেতে। ঠাকুমা উঠে যেতে, আস্তে আস্তে মাধুরীকে নিরঞ্জন প্রশ্ন করে—হ্যাঁরে দিদি, স্কুলে গিয়ে কি করলি ?

মাধুরী বলে—কেন, লেখাপড়া করলুম।

একটু থেমে নিরঞ্জন বলে—তুই পারলি ?

মাধুরী সগর্বে উত্তর দেয়—পারব না কেন ? আমি তো মার কাছে অ, আ পড়েছি না !

নিরঞ্জন বলে—তোর স্কুলে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ?

সগর্বে মাধুরী বলে—তুই সেখানে গিয়ে কি করবি ? কোথায় পড়ে-টড়ে যাবি, তা ছাড়া বই পড়বি কি করে, তুই তো দেখতে পাস না।

একরকম প্রতিবাদের সুরে নিরঞ্জন বলে—পড়ে যাব কেন রে ? এই তো বাড়িতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি কি পড়ে যাচ্ছি !

এতবড় প্রশ্নের জবাব অষ্টমবর্ষীয়া মাধুরীর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে দিতেও পারলো না। কেবল বললো—তুই তো ভাল করে চোখই চাইতে পারিস না, তা দেখবি কি করে।

সেদিন মাধুরীর সঙ্গে খেলতে নিরঞ্জন আর বাগানে গেল না। সারাটা বিকেল সে চুপ করে বাগানের দিকে মুখ করে বারান্দার ওপর বসে রইলো। ঠাকুমা ঠাকুরঘর থেকে শঙ্খধ্বনি করায় তবে সে বুঝতে পারলো সন্ধ্যা হয়েছে। আজ নিরঞ্জনের মনে হচ্ছিলো, তার জীবনে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সে যদি ছুটে কখনও একা বাগানে বেরিয়ে যেত, মালতী দেবীর কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যেত—অ দাদু, কোথায় গেলি ?

দুষ্টুমি করে নিরঞ্জন অনেক সময় বাগান থেকে সাড়া দিত না। হাঁহাঁ করে মালতী দেবী লোকজন সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসতেন বাগানের মধ্যে। তাঁর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা যেত—লোকজনকে উদ্দেশ করে তিনি বলতেন—ওরে তোরা খুঁজে দেখ, ভাল করে খুঁজে দেখ ছেলেটা পুকুরে পড়ে গেল কি না। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাধুরী বাগানে একা বেড়ালেও ঠাকুমা কখনও ব্যস্ত হতেন না। এই ধরনের সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতে শিশু নিরঞ্জন আসে তাদের বাহিরের মহলে। তার পরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে, দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে।

সুজিত নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়েই বলে—খোকা, ভেতরে আয়।

নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে না ঢুকে দুপা এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুজিত আবার বলে—কি হয়েছে রে ? কথা বলছিস না ?

বাবার মিষ্টি কথা শুনে নিরঞ্জনের রুদ্ধ অভিমান যেন ফেটে পড়তে চায়। ঠোঁট ফুলিয়ে সে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে।

নির্মলার কাছে বকুনি খেয়েছে মনে করে সুজিত তাকে আদর করে কোলে তুলে নেয়। তার পরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে বাবা, কাঁদছ কেন ?

বাপের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে এইবার নিরঞ্জন সত্যিই আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

অনেক সাধ্যসাধনার পর নিরঞ্জন বলে—দিদিকে তুমি বেশী ভালবাস, তাই তাকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছ। আমাকে ভালবাস না, তাই তুমি আমাকে স্কুলে ভরতি করে দাওনি।

অভিযোগ শিশুর হলেও এ যে নির্মম সত্য। সুজিত কি উত্তর দিয়ে, মিথ্যা আশায়, কোন্ ছলে আজ ছেলেকে ভোলাবে। তাই খানিকটা চুপ করে থেকে সুজিত বলে—তুমি কি করে পড়বে বাবা, তুমি যে দেখতে পাও না।

নিরঞ্জন এই কথাটা আজ সকাল থেকে বহুবার শুনেছে। দেখতে-না-পাওয়া ব্যাপারটা যে কি তা খানিকটা সে উপলব্ধিও করেছে। তার মনে হয়, তার দিদি অনেক সময়ে একটা বই নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। জিজ্ঞেস করলে বলে—"বইটার মধ্যে কি সুন্দর ছবি আছে, তাই দেখছি।" হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিরঞ্জনও দেখবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। মাধুরী ওদিকে তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করেছে—মা, দেখে যাও নিরু আমার বই ছিঁড়ে দিচ্ছে।

ধুত্তোর বলে মাধুরীর বইটাকে নিরু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। আজ স্পষ্ট সে সব কথা নিরঞ্জনের মনে পড়তে লাগলো। তাই সে খানিক পরে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে—তা হলে কি আমি কিছুই করতে পারব না?

সুজিতনাথ কি যেন খানিকটা ভেবে নেয়। তার পরে ধরাগলায় বলে—কেন পারবে না, তুমি ভাল গান শিখতে পার, কালই আমি তোমার জন্যে ভাল গানের মাস্টার নিয়ে আসব। লোকজন তোমার গান শুনে কত বাহবা দেবে, আসরে তোমায় নিয়ে যাবে, কত নাম হবে তোমার।

নিরঞ্জন কথাটা খানিকটা বুঝলো খানিকটা বুঝলো না। তবে সে এইটুকু বুঝলো, মন দিয়ে গান শিখতে পারলে তার অনেক, অনেক

নাম হবে। আনন্দে সেই খবরটা ঠাকুমাকে দেবার জন্যে সে ছুটে ভেতরে চলে গেল।

এর কিছুদিন পর থেকেই বিখ্যাত শিল্পী মীর্জা সাহেবের কাছে শুরু হলো নিরঞ্জনের সংগীতসাধনা। নিরঞ্জন গান শিখবে, কথাটা মালতী দেবী জানতে পেরে একবার সুজিতকে বলেন—ওকে তুই গান শেখাচ্ছিস্, কাজটা কি ভাল হলো!

গম্ভীর মুখে সুজিত উত্তর করে—ভাল কি খারাপ জানি না মা, একটা কিছু করতে তো হবে, নইলে ছেলেটা থাকবে কি নিয়ে।

মালতী দেবী বলেন—তা বটে, কিন্তু তোর বাবা তোকে গান-বাজনা শিখতে বারণ করে দিয়েছিলেন যে।

সুজিত বলে—বাবা আমাকেই শিখতে বারণ করেছিলেন, কারণ এই গান নিয়েই বাবাতে আর জ্যাঠামশাইতে ঝগড়া হয়েছিল। তা ছাড়া আমি দেখতে পাই, আমার কথা স্বতন্ত্র। আমার পক্ষে ওই ধরনের বাঈজীর পাল্লায় পড়া আশ্চর্য তো কিছু নয়, কিন্তু খোকা তো দেখতে পায় না। সেই জন্যে ওর পক্ষে বাঈজীর পাল্লায় পড়াও সম্ভব নয়। তা ছাড়া খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই তো সব নয় মা। বেঁচে থাকতে গেলে চাই আনন্দ। তা পেতে গেলে এই ধরনের কোনও একটা জিনিস শেখা চাই। লেখাপড়া যখন ওর হবেই না, তখন গানবাজনা শিখতে আর দোষ কি?

সেদিন কথাটা সেইখানেই থেমে যায়। মীর্জা সাহেবের কাছে শিশু নিরঞ্জনের সংগীতশিক্ষাও নিয়মিত চলতে থাকে।

বছরখানেক এই ভাবে কাটবার পর সুজিত এসে মীর্জা সাহেবকে প্রশ্ন করে—ওস্তাদজী, খোকা গান শিখছে কেমন? গান ও শিখবে তো?

বৃদ্ধ ওস্তাদ মাথা নেড়ে জানান, এই স্বল্প দিনের মধ্যে নিরঞ্জন যা আয়ত্ত করে নিয়েছে তা সাধারণ ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। সরস্বতীর

প্রসাদ যদি না সে পেত, তা হলে কখনই এমন গান সে গাইতে পারতো না।

স্বজিত কথা শুনে তো স্তম্ভিত।

বৃদ্ধ ওস্তাদ মনে করেন, স্বজিত বুঝি তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। তাই প্রমাণ দেবার জন্য তিনি শিশু নিরঞ্জনকে গান ধরতে বলেন।

শুরু হলো বসন্ত রাগিণীতে আলাপ। সাত বছরের ছেলে নিরঞ্জন, কোলে তানপুরো নিয়ে তবলার সঙ্গে এমন সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে যেতে থাকে যে, বিশেষ প্রতিভা না থাকলে তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

সুজিত তো গান শুনে স্তম্ভিত। বৃদ্ধ ওস্তাদ মীর্জা সাহেব বলেন—তামাম ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন প্রতিভাবান ছাত্র একটিও পাইনি। যদি দশ বছর কোনওরকম ভাবে ওকে শেখাতে পারি তা হলে ভারতবর্ষে গানের জগতে ওর সমকক্ষ আর কেউ হবে না।

স্তম্ভিত হয়ে স্বজিত সেখান থেকে উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। বসে বসে ভাবতে থাকে নানা কথা। নিছক ছেলে ভুলোতে গিয়ে এ কি রত্ন সে আজ আবিষ্কার করলো! মৃত হরিহর রায় আবার কি তার পুত্র হয়ে জন্মেছে! ঠিক এমনি সময় তার মনে হয়, খোকা যদি না অন্ধ হয়ে জন্মাতো তা হলে গান তাকে তিনি কিছুতেই শিখতে দিতেন না। তাই কি সে আজ অন্ধ হয়ে জন্মেছে! মনে পড়ে যায় তার ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ মীর্জা সাহেবের কথা। যদি কোনওরকম-ভাবে দশ বছর শেখাতে পারি তা হলে সংগীত-জগতে ও হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পুত্র-গৌরবে সুজিতের মন ভরে যায় আনন্দ-সুরভিতে।

*

* *

এতক্ষণ যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করলাম, এর অধিকাংশ ঘটনার কথাই আমার স্বর্গীয় পিতা ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী পড়ে জানতে পেরেছিলাম। এই সমস্ত ঘটনা তিনি রায় বাড়ির কাগজপত্র, মালতী দেবী আর সুজিতবাবুর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। রায় পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ কত নিবিড় ছিল তা তাঁর ডায়েরী পড়লে বোঝা যায়।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল. ডিগ্রি লাভ করে তিনি দিনকতক আদালতে আইন ব্যবসাও করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তাঁর ভাল লাগেনি। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি। তাই অর্থ উপার্জন না করে বসে বসে কালক্ষেপ করার মত সময় তাঁর ছিল না। তখন তিনি বিবাহ করে সংসারী হয়েছেন। তার ওপর আমার বড়দা, যিনি উত্তরকালে নিরঞ্জনের মৃত্যু অবধি সেই কাজেই বহাল ছিলেন, তিনিও তখন জন্মেছেন। আমার বড়দির বয়স তখন বছর পাঁচ।

আদালত ছেড়ে দিয়ে বাবা রোজই কাগজের বিজ্ঞাপন দেখতেন চাকরির জন্যে। তখন অবশ্য ইংরেজী সওদাগরী অফিসে চাকরি হওয়া আজকের মত দুরূহ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয়। প্রাণ থাকতেও ইংরেজের গোলামি করব না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিছুদিন তিনি বিপ্লবী ‘অনুশীলন’ দলের সভ্যও ছিলেন। পরে এই দলে ভাঙন দেখা দিতে তিনি আবার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে মনস্থ করেন। তাঁর আদর্শ পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বক্তৃতায় তাঁর চরিত্রের হয় পরিবর্তন।

হিংসার পথ ছেড়ে তাঁর বহু বন্ধু এর কিছু আগে থেকেই "সত্যসুন্দরের" আরাধনায় মন দেয়। পাছে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায় এই ভয়ে ঠাকুরদা মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বাবার বিয়ে দেন। বিয়ের কিছু পরে বাবা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে হিমালয়েতে তপস্যাও করেন। কিন্তু ও-পথ নীরস বোধ হওয়ায় তিনি ফিরে আসেন আবার সংসারে। সংসারের তাগিদেই তিনি খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতেন। এমনি সময়ে তাঁর চোখে পড়ে গেল সুজিত রায়ের দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন। তাঁর বিশাল জমিদারি দেখাশোনা করবার জন্য তিনি একজন ম্যানেজার চেয়েছেন।

বাবা গিয়ে দেখা করলেন, এবং চাকরিতে বহাল হলেন। নিরঞ্জন তখন পাঁচ ছ' বছরের ছেলে।

কিছুদিন কাজ করার পর বাবাও সুজিতনাথের মতন শিশু নিরঞ্জনের গান শুনে মুগ্ধ হন। ছেলেবেলা থেকেই নিরঞ্জনের ব্যবহার অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। বাবা সেই ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। নিরঞ্জনও লাভ করলো তাঁর কাছ থেকে পুত্রস্নেহ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন মিশনারী সাহেব আসেন কোলকাতায়, "লুই ব্রেলে"র প্রণালী শিক্ষা দিতে। এই প্রণালীর সাহায্যে কাগজের ওপর সৃষ্টি করা হয় উঁচুনীচু কয়েকটা বিন্দু। এই বিন্দুর দ্বারাই অন্ধদের বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়। রেভারেণ্ড লালবিহারী শা এবং শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়েরা তাঁর কাছে এই প্রণালী শিক্ষা করেন। অবশ্য তিনি এ কাজে আর বিশেষ অগ্রসর হননি। কিন্তু লালবিহারী শা তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন অন্ধদের শিক্ষার কাজে। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে 'কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়'।

বাবা সে খবর জানতেন। তাই তিনি নিরঞ্জনকে সেই স্কুলে ভরতি করবার জন্য সুজিতবাবুকে অনুরোধ করেন।

অন্ধরা লেখাপড়া শিখতে পারে এবং তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে বিশেষ ধরনের বর্ণমালা আছে একথা জানতে পেরে সুজিতবাবুও উৎসাহিত হন, এবং নিরঞ্জনকে ভরতি করে দেন।

বাড়ির গাড়িতে সে স্কুলে যেত, এবং সেখান থেকে রোজ বিকেলে ফিরে আসতো। এই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হলো নিরঞ্জনের প্রতিভার আর একটা দিক।

পর্যায়ক্রমে গান ও লেখাপড়া দুটোরই শিক্ষা চলতে থাকে নিরঞ্জনের জীবনে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে নিরঞ্জন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। শুধু পাস নয়, সংস্কৃত ও ইতিহাসে নিরঞ্জন প্রথম স্থান অধিকার করে।

এর পরে সে ভরতি হয় কোলকাতার কোনও বিখ্যাত কলেজে। ঐ বৎসরই ভারতের বিখ্যাত সংগীতশিল্পীরা কোলকাতায় সমবেত হন। এই সমবেত শিল্পীদের সামনে নিরঞ্জন দেয় তার সংগীতের পরীক্ষা। বাবা ডায়েরীতে সে কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন—"আজ সন্ধ্যের সময় বৃদ্ধ ওস্তাদ মীর্জা সাহেব আর আমি নিরঞ্জনকে নিয়ে যাই সেই আসরে। তিল ধারণের জায়গাও ছিল না সেখানে। প্রথমে অনেকেই গান করেন, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীকে কেউই মুগ্ধ করতে পারেননি। শিল্পীদের নিদারুণ পরাজয়ে শ্রোতৃবৃন্দ তখন উঠেছে ক্ষেপে। কেউ বা হাততালি দিচ্ছে, কেউ বা শিস দিচ্ছে। শ্রোতৃমণ্ডলীকে শান্ত করতে গেলে প্রয়োজন শিল্পীর সতেজ কণ্ঠস্বরের। এই কণ্ঠস্বরের অভাব যদি কারুর মধ্যে ঘটতো, তা হলে তাকে মেনে নিতে হতো, নিদারুণ পরাজয়।

বৃদ্ধ ওস্তাদরা কেউই তখন দর্শকদের সামনে আসতে সাহস করলেন না। সকলেই সাজঘরে বসে কী করা হবে তাই ভেবে চলেছেন।

আমরা সেদিন ভেবেছিলাম, আসর বুঝি ভেঙেই যাবে! এমন কোন্ শিল্পী আছে, যে এই উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে পারে?

ঠিক এমনি সময় বৃদ্ধ ওস্তাদ মীর্জা সাহেব দাঁড়িয়ে সকলকে বললেন —আপনারা ভাবছেন কেন? আমার শিষ্য নিরঞ্জন এখন গান করবে ...আর তাকে সাহস দেবার জন্যে আমি থাকবো তার সঙ্গে।

মীর্জা সাহেব বলেন কি?

সব শিল্পী মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করেন। কেউ বলেন, বুড়ো বয়সে মীর্জা সাহেবের বোধহয় ভীমরতি ধরেছে! নিজের সুনাম আর বুঝি তিনি রক্ষা করতে পারেন না!

কিন্তু মীর্জা সাহেবের কারুর দিকেই কোন দৃষ্টি নেই। নিরঞ্জনের হাত ধরে তিনি ততক্ষণে এসে বসেছেন মঞ্চের ওপর। সাটিনের চোগা-চাপকান পরেছিল নিরঞ্জন সেদিন। সাঁচ্চা জরির কাজের ওপর আসরের আলো পড়তেই তা চকচক করে উঠলো। নিরঞ্জন দেখতে সুন্দর ছিল বরাবরই। কিন্তু সে রাত্রে তানপুরো হাতে ঐ পোশাকে তাকে এমন সুন্দর দেখতে হয়েছিল, যা দেখে অনেকে স্তব্ধ হয়ে যায়।

নিরঞ্জনের বয়স লক্ষ্য করে অনেক ওস্তাদের মুখেই ফুটে উঠেছে বাঁকা বিদ্রূপের হাসি। সারেঙ্গ আর তবলায় সুর বেঁধে নেওয়ার পর নিরঞ্জন শুরু করে মালকোষ রাগের আলাপ। বহুবার নিরঞ্জনের গান শুনেছি—ভালও লেগেছে। সেই পরিবেশের মধ্যে সে রাত্রে যেমন তার গান শুনেছিলাম, তেমন গান গাইতে তাকে আর কোনদিনই শুনিনি।

কোথায় গেল দর্শকদের উত্তেজনা আর চিৎকার! ধীরে ধীরে তারা সকলেই ডুবে যায় নিরঞ্জনের সুরের আলাপের মধ্যে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ মীর্জা সাহেবও তার সঙ্গে গান ধরছেন—কিন্তু তা কতক্ষণের জন্য! দু'মিনিটের মধ্যেই নিরঞ্জন তাঁর মুখ থেকে গান কেড়ে

নিয়ে সাপট তান তুলে আর তেহাই দিয়ে শ্রোতাদের করে তুলছে উত্তেজিত।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর নিরঞ্জনের গান থামলো। হাততালি যেন থামতেই চায় না। নিরঞ্জন উঠে যেতে চায়—কিন্তু শ্রোতারা তাকে ছাড়ে না। অবশেষে রাত চারটের সময় আহির ভৈরবে ভজন গান করে নিরঞ্জন শ্রোতাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। সেদিন সব শিল্পী একবাক্যে স্বীকার করেন, নিরঞ্জনের সংগীত-শিক্ষার তুলনা হয় না! যে কোন শিল্পী তার কণ্ঠস্বরকে হিংসাই করবে। পরের দিন কোলকাতার সমস্ত ইংরেজী বাংলা দৈনিক পত্র-গুলো নিরঞ্জন রায়ের প্রশংসায় হয়ে ওঠে পঞ্চমুখ।

এর পর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নিরঞ্জনের আসতে থাকে গানের জলসায় ডাক। যেখানেই গানের আসর সেইখানেই নিরঞ্জন। নিরঞ্জন ছাড়া কোনও গানের আসর শ্রোতারা যেন ভাবতেই পারতো না। বড় বড় খবরের কাগজে নিরঞ্জনের ছবি ছাপা হতো। সমা-লোচকরা তার গানের সমালোচনা করতেন। বলা বাহুল্য, তার বিপক্ষে সমালোচনা কেউই করতো না। এই সমস্ত খবরের কাগজ বাবা সযত্নে কেটে রাখতেন। নিরঞ্জনের বাড়িতে চাকরি করবার সময় আমি তা দেখেছিলাম। রেকর্ড রেডিও সর্বত্র থেকেই তার ডাক আসে। এককথায় খুব অল্প দিনের মধ্যে নিরঞ্জন বিখ্যাত হয়ে ওঠে সারা ভারতবর্ষে।

এমনি সময় নিরঞ্জনের কলেজে একটা ঘটনা ঘটে, যা আমি জানতে পেরেছিলাম বাবার ডায়েরী থেকে নয়, ডাঃ ঘোষের লেখা খাতা থেকে। কেমন করে সে খাতা আমার হস্তগত হলো সে কথা পরে বলব। নিরঞ্জন ফিরে এসেছে বোম্বের একটি জলসা থেকে। কলেজ কামাই হয়েছে, বাৎসরিক পরীক্ষারও আর বেশী দেরি নেই। তাই সে লিজার পিরিয়ডে বসে নিজের মনেই পড়াশুনা করছিল। ঘর ছিল

খালি। নিরঞ্জনের সঙ্গের দরোয়নটা কাছেই ছিল। ঠিক এমনি সময় কে যেন তাকে মেয়েলী কণ্ঠে বললো—আপনি তো বোম্বের আসরে গান করে খুব নাম করে এসেছেন!

প্রায় এক বছর কলেজে পড়া সত্বেও নিরঞ্জনের বিশেষ কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। বোধ হয় নিরঞ্জনের বড় গাড়িটা আর তার সাজপোশাকে তাকে অন্য ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। তাই এহেন নির্জন ঘরে হঠাৎ মিষ্টি মেয়েলী সুর শুনে নিরঞ্জন যে চমকে যাবে তার আর আশ্চর্য কি! যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে নিয়ে আগন্তুকের দিকে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে নিরঞ্জন বলে—আমায় বলছেন কি?

মেয়েটি পরম আত্মীয়ের মত জবাব দেয়—আপনাকে বলছি না তো কাকে বলব বলুন। সমস্ত কলেজের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোনও ছাত্র ছাত্রী নেই যে বোম্বেতে গানের আসর জয় করে এসেছে।

নিরঞ্জন হেসে জবাব দেয়—ওটা আমাকে একটু বাড়িয়ে বলছেন না কি?

মেয়েটি বলে—বাড়িয়ে বলার কথা যদি বলেন তা হলে জয়ের কথা তো বাসন্তী বলেনি, বলেছে খবরের কাগজগুলো। তবে তারা যদি বলে থাকে, সে কথা তো আমার জানবার কথা নয়।

নিজের প্রশংসার প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যেই হোক, আর মেয়েটির সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছাতেই হোক, নিরঞ্জন বলে—তা হলে আপনার নাম বাসন্তী, কি বলেন? কোন্ ইয়ারে পড়েন আপনি?

—আমি পড়ি আপনারই সঙ্গে। তবে আপনার মত অত ভাল স্টুডেণ্ট তো নই যে সকলে আমাকে চিনবে! বা আমার ছবিও খবরের কাগজে ছাপা হবে না বিশেষ কোনও গুণের জন্যে।

নিরঞ্জন বলে—আপনার দেখছি খবরের কাগজে ছবি বার করা

খুব ইচ্ছে। তা শিখুন না কেন গান। দু চারদিন প্র্যাকটিস করলে আপনার ছবিও কাগজে বেরুতে পারে।

—সত্যি বলছেন ?—বাসন্তী বলে—আমার গান হবে ?

নিরঞ্জন বলে—চেষ্টা করলে কি না হয়।

—কিন্তু কে শেখাবে ?—বাসন্তী বলে।

নিরঞ্জন বলে—লোক যদি না পান, আমিই শেখাব।

তাদের যখন এইরকম কথাবার্তা চলছিল, ঠিক সেই সময় ঘণ্টা পড়ে যায়।

নিরঞ্জন বইপত্র গুছিয়ে নেয় ক্লাসে যাবার জন্য। বাসন্তী চলে যায় মেয়েদের কমন রুমে। যাবার সময়ে বলে যায়, ছুটির সময় গেটের কাছে একটু দাঁড়াবেন। তখন এ বিষয়ে কথা হবে।

সারাদিন ক্লাসের পর ছুটির ঘণ্টা পড়তে নিরঞ্জন এসে দাঁড়ায় গেটের বাইরে। ড্রাইভারকে বলে রাস্তার পাশে গাড়ি কোথাও পার্ক করবার জন্য। উৎসুকভাবে বার বার দরোয়ানকে প্রশ্ন করতে থাকে বাসন্তীকে সে কোথাও দেখছে কি না।

কলেজের বেশির ভাগ ছেলে মেয়ে বেরিয়ে যাবার পর বাসন্তী আসে ধীর পদবিক্ষেপে। নিরঞ্জনকে বলে—আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ?

একরকম বিস্মিত হয়ে নিরঞ্জন বলে—বাঃ, আপনিই তো বললেন অপেক্ষা করবার জন্যে। তা আপনার এত দেরি ?

সলজ্জ ভাবে বাসন্তী বলে—কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে নয়, চলুন আপনার গাড়িতে গিয়ে ওঠা যাক।

তারা দু'জনেই এসে বসে নিরঞ্জনদের বিরাট গাড়িটায়। নিরঞ্জনকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে বাসন্তী বলে—সোজা চলো মাঠ হয়ে, হরিশ মুখার্জী রোড।

নিরঞ্জন বলে—আপনি তা হলে ভবানীপুরেই থাকেন ?

বাসন্তী যেন কি খানিকটা ভেবে নেয়, তারপর বলে—ঠিক না হলেও ওর কাছাকাছি থাকি।

নিরঞ্জন ভাবে বাসন্তী বোধ হয় ঠিকানা বলতে চায় না। না বলুক, ক্ষতি নেই। যেখানে নামবে, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে।

নিরঞ্জন বলে—আপনি তা হলে আপনার গান শেখবার মনস্থ করলেন ?

বাসন্তী বলে—আমাদের মত মেয়ের আবার গান শেখা ?

নিরঞ্জন বলে—তা হোক তবু, আপনার যখন ইচ্ছে আছে, তখন একটু চেষ্টা করে দেখুন না।

বাসন্তী বলে—শেখাবে কে ?

একটু বিনয়মিশ্রিত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলে—যতদিন না ভাল লোক পাচ্ছেন ততদিন আমিই আপনাকে বলে দেব।

—কিন্তু গান শিখতে গেলে একটা জায়গা তো চাই! আমার বাড়িতে হবে না। আপনার বাড়িতে যদি যাই ?

—আমার বাড়িতে ? দেখুন একটা কথা হচ্ছে কি, আমার বাবা এখনও বেঁচে রয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যদি আপনাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাই, বিশেষ করে গান শেখাবার জন্যে, কাজটা তাঁরা কোন্ চোখে দেখবেন সেইটেই হচ্ছে ভাবনার কথা!

বাসন্তী একটু ভেবে বলে—তা বটে। আমারও ঠিক ওই সমস্যা। অথচ গান শেখবার ঝোঁকও আমার প্রবল। আর আপনার মতন মাস্টার পাচ্ছি কোথায় ?

নিরঞ্জন হেসে বলে—এটা কিন্তু আমাকে বাড়িয়ে বললেন।

বাসন্তী বলে—বিশ্বাস করুন, মোটেই আমি বাড়িয়ে বলিনি। রেকর্ডে যখন আপনার গান শুনি তখন সত্যিই ভাবি আপনার মত গলার আওয়াজ যদি আমার হতো, তা হলে—

নিরঞ্জন কথার মাঝখানেই বলে ওঠে—তা কি করে হবে বাসন্তী দেবী! মেয়েছেলের গলা কি পুরুষের মত হলে শুনতে ভাল হবে? লোকে তো শুনে হাসবে!

কথাটা শুনে তারা দু'জনেই হেসে ওঠে।

ড্রাইভার ততক্ষণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার হয়ে ঢুকে পড়েছে হরিশ মুখার্জী রোডে।

বাসন্তী একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে—দেখুন, আমার নামবার সময় হলো। আমার গান শেখবার ইচ্ছা যখন এত প্রবল, আর আপনার গান শেখাবার ইচ্ছা যখন এতটা রয়েছে তখন ব্যবস্থা একটা না একটা হবেই। আজ তবে চলি। আমি এসে পড়েছি।

পরমুহূর্তেই বাসন্তী সচকিত হয়ে ড্রাইভারকে বলে—গাড়ি থামাও।

গাড়ি থামতে বাসন্তী একটা ছোট নমস্কার জানিয়ে বলে—কাল কলেজে কিন্তু দেখা যেন হয়।

বাসন্তী নেমে যেতেই নিরঞ্জন ড্রাইভারকে বলে—একটু লক্ষ্য করো তো, ও কোন্ বাড়িতে ঢোকে।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার বলে—উনি গিয়ে ঢুকলেন একটা গলির মধ্যে।

নিরঞ্জনের ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দেয় তার লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ির দিকে।

বাসন্তীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে কি ছিল, তা কেবল নিরঞ্জনই বলতে পারতো। সামান্য কথা, একটু আত্মীয়তার ভাব, এতেই নিরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে যায়। গাড়ির সোফায় হেলান দিয়ে বাসন্তীর সঙ্গে সারাদিন ধরে তার কি কথা হয়েছিল সেই কথাই চিন্তা করতে থাকে। একটা মধুর আবেশ—যে আবেশে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে বেশ ভাল লাগে।

চিন্তা করতে করতে যেন সে মাতাল হয়ে ওঠে। রবিবাবুর একটা গানের কলি নিজের মনেই গুনগুন করে গাইতে থাকে।

গাড়ি এসে পৌঁছোয় নিরঞ্জনদের বাড়িতে। নিরঞ্জনের কেবলই মনে হয়, আবার কখন বাসন্তীর সঙ্গে দেখা হবে।

এরই কয়েক বছর আগে মালতী দেবী মারা গেছেন। নিরঞ্জনের কাছে জগৎ সংসার একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবয়েস থেকেই মালতী দেবীর স্নেহে মানুষ হবার ফলে, নিজের মা নির্মলা দেবীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারেও কোনও দিনই তার বনতো না। খুঁটিনাটি নিয়ে মনকষাকষি লেগে থাকতো সব সময়। তবে মালতী দেবীর মৃত্যুর পর একটা জিনিস নিরঞ্জন অনুভব করেছে যে তার মা-ই এখন এই বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর মুখের ওপর কথা বলা তার শোভা পায় না। অভিমান করে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকলেও কেউ এসে তাকে আর ঠাকুমার মত স্নেহের পরশ দিয়ে আগ্রহের আতিশয্য দেখাবে না।

যখন মালতী দেবী মারা যান তখন নিরঞ্জনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হতে আর মাত্র পনেরো দিন দেরি। নিজের পড়ার ঘরে বসে সে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এমন সময় বাড়ির মধ্যে লোকজনের ছুটোছুটির আওয়াজ পেয়ে নিরঞ্জন বেরিয়ে আসে নিজের পড়ার ঘর থেকে। সরকার কাকা, অর্থাৎ আমার বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে সরকার কাকা ?

সস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার বাবা বলেন—নিরু, কি বলবো বাবা, গিন্নীমা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন !

ক্ষণেকের জন্য নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে থাকে তাঁর বুকের ওপর। তারপরে সে ছুটে যায় মালতী দেবীর ঘরের উদ্দেশ্যে।

কাছেই সুজিতবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার বাবাকে উদ্দেশ্য

করে বলেন—ননী, আমি নয়, খোকন আজকে মাতৃহারা হলো। ওর ঠাকুমাকে ছেড়ে ওর পক্ষে—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি আরও বলেন—কি বলবো ননী! এই উনিশটা বছর মা নিরুকে পেয়ে তীর্থধর্ম, ঠাকুর-দেবতা সব কিছু ভুলে ছিলেন। নিরুই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান। আর নিরু? এক-রাত্তির কখনও ঠাকুমাকে ছেড়ে শুতে পারতো না। ঠাকুমা গায়ে না হাত বুলিয়ে দিলে ওর রাত্তিরে ঘুম আসতে চাইতো না।

পরশু অবধি দেখেছি মার এত অসুখেও যখন নিরু গিয়ে তাঁর খাটে শুলো, তখন নিজের সমস্ত যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে আমাকে আর নার্সকে ইশারা করে বললেন—তাঁকে খোকার বিছানায় নিয়ে যেতে। আমি তাঁকে বিছানা থেকে উঠতে দিইনি বলে, তিনি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি কত ডাকলাম। বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তিনি কিন্তু সেই যে মুখ ফিরিয়ে শুলেন, আর মুখ ফেরালেন না।

নার্স ওষুধ খাওয়াতে গেল। এক হাত মুখে চাপা দিয়ে ওষুধের কাপ ধরা নার্সের হাতটা ঠেলে দিলেন।

আমি বুঝলাম, খোকনকে কাছে না পেলে ওঁকে ওষুধ খাওয়ানো শক্ত। খোকনের ঘরে গিয়ে দেখলাম সেও ঘুমোয়নি। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বোধ হয় আমাকে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তাকে লক্ষ্য করে বলি,—ঠাকুমা ওষুধ খাচ্ছে না, যা, তাকে ওষুধ খাওয়া!

বিছানা ছেড়ে সে উঠে মায়ের কাছে যেতেই, মা তাড়াতাড়ি তার দিকে পাশ ফিরলেন।

বুকের ওপর হাত রেখে নিরু বললো—ঠাকুমা ওষুধ খাচ্ছ না কেন?

উত্তরে কি যে তিনি বললেন—তা তিনিই জানেন। তারপরে

নিরুর মুখখানা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলেন। দু'চোখ বেয়ে তাঁর অঝোরধারে জল পড়তে লাগলো।

নার্স ওষুধ দিল, তিনি খেলেন। এই পৃথিবী, সাজানো সংসার, ঠাকুর-দেবতা ছেড়ে যেতে তাঁর যত না কষ্ট হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী কষ্ট হয়েছিল খোকনকে ছেড়ে যেতে।—কথা বলতে বলতে সুজিতবাবু চোখ মুছতে থাকেন।

আমার বাবা উত্তরে বলেন—গিন্নীমা চিরদিনই নিরঞ্জনকে ভালবাসতেন।

সুজিতবাবু বলেন—ভালবাসা বললে, ছোট করা হয় ননী। নাতি-নাতনীকে ঠাকুমা ভালবাসবে সেটা বড় কথা নয়। আমার মা কিন্তু ছিলেন সাধারণের থেকে ভিন্ন। এই দেখ না, আমি তাঁর নিজের ছেলে নই, কবে মা হারিয়েছি, মনেও নেই! মার মুখে শুনেছিলুম, বাবাও নাকি তার পরে বেশী দিন বাঁচেননি। কিন্তু ওই শোনা কথাই। আমার নিজের মার ফটোটা বাড়িতে না থাকলে, তাঁর অস্তিত্বের কথাই হয়তো আমি ভুলে যেতাম। কিন্তু জেঠাইমা কোনওদিন কি বুঝতে দিয়েছিলেন, তিনি আমার মা নন! আমি তাঁর পেটের ছেলে নই! আমার দু' দুবার অসুখের সময় মা যেভাবে আমাকে সেবা করেছিলেন, বোধ হয় আমার গর্ভধারিণী বেঁচে থাকলেও তেমনটি পারতেন কি না সন্দেহ।

বাবা সান্ত্বনার সুরে বলেন—মেয়েদের সেবা একটা স্বভাবের মত।

অতি দুঃখে সুজিতবাবু একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন—কথাটা তোমার ঠিক হলো না ননী! এই তো আমার স্ত্রী। তার মধ্যে তো এমন স্বভাব দেখি না। খোকন তো তার পেটের ছেলে। খোকনের টাইফয়েডের সময় মা যতটা উদ্বিগ্ন হতেন, তেমন তো তার নিজের মা হতো না। এ বাড়ির প্রত্যেক ঝি-চাকরের খাওয়ার শেষে তবে মা

খেতেন। আমি তাঁর ছেলে, আমার জন্যে করবেন সে আর বেশী কথা কি! নিজের জন্যে ভাবতে তাঁকে কোনওদিনই দেখিনি। আর নির্মলা, যাক সে সমস্ত কথা।—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি ফের বলেন—খোকনের মত আমিও আজ অনাথ হলাম। চোখের জলটাকে মুছে ফেলে তিনি বলেন—তুমি যাও ননী, তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা কর। আমি দেখি খোকনটা কোথায় গেল। হ্যাঁ, আর যে সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া দরকার মনে কর, তাদের খবর দাও।

সুজিতবাবু কথা শেষ করে অন্দরমহলের দিকে চলে যান। দালান পার হয়ে মালতী দেবীর ঘরের সামনে এসে তিনি দেখেন নির্মলা দেবী বসে শোকের অভিনয় করে চলেছেন। মালতী দেবীর কর্তৃত্ব নির্মলার কোনওদিনই ভাল লাগতো না। অথচ এমনই ছিল বিধির নির্বন্ধ, মালতী দেবী কারুর ওপর কোনওদিন কর্তৃত্বই করতেন না, তবুও তাঁর ক্ষুদ্র ইচ্ছেটুকুও কেউ অমান্য করেনি।

সুজিতবাবুকে দেখে নির্মলা মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিলেন। যে কয়েকজন আত্মীয় মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তখনই শোক জানাবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা নির্মলা দেবীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আর মাধুরী? বারান্দার ওপর পড়ে সে তার ঠাকুমার জন্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। বাইরের দৃশ্যগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুজিতবাবু গিয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। সেখানে নিরঞ্জন বিছানার ওপর উপুড় হয়ে তার ঠাকুমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অবিরাম কি বলে চলেছে। সুজিতবাবু প্রশ্ন করেন—কি বলছিস্ রে খোকা?

মুখ না সরিয়েই নিরঞ্জন বললো—ঠাকুমা বলে গিয়েছিল, মরবার সময় নাম শোনাস, তাই নাম শোনাচ্ছি।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য!

সুজিতবাবুর অশ্রু আর বাধা মানে না। ছোট ছেলের মতন নিরঞ্জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনিও হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন। কিন্তু নিরঞ্জন, আপনার চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে নিয়ে সুজিতবাবুকে উদ্দেশ করে বলে—তুমি কাঁদছ বাবা! কেঁদ না। ঠাকুমার আত্মা বোধহয় এখনও এ ঘর ছেড়ে যায়নি। তোমাকে কাঁদতে দেখলে তাঁর যে কষ্ট হবে!

দু'হাত দিয়ে ছেলেকে আরও জোর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সুজিতবাবু বলেন—ওরে, আমি কি কাঁদছি সাধে! সকলকারই মা মারা যায়, তার জন্যে দুঃখু করি না। কিন্তু তোর কি হবে, তোকে কে দেখবে?

শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দেয়—কেন, তুমি তো রয়েছ! মা তো আছে!

এর উত্তরে সুজিতবাবু আর কোনও কথা বলতে পারেন না। নিরঞ্জন মাত্র উনিশ বছরের ছেলে হয়েও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

স্বামি-পুত্র ঘরের মধ্যে কি করছে দেখবার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোনও কারণেই হোক, ঠিক সেই সময় নির্মলা দেবী ঘরে এসে ঢোকেন। সুজিতবাবুকে উদ্দেশ করে বলেন—কেবল তো কাঁদলে চলবে না, সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে সুজিতবাবু বলেন—এই যাই!

এর পর মালতী দেবীর মৃতদেহকে নির্মলা দেবী আর মাধুরীতে করলো সুসজ্জিত। বাবার ডায়েরী পড়ে জানতে পেরেছি ঠিক এই সময়টা নিরঞ্জন যে কোথায় কাটিয়েছিল, তা কেউই লক্ষ্য করেনি।

আত্মীয়স্বজন নিয়ে বাইরে সুজিতবাবু ছিলেন ব্যস্ত। মৃতের ঘরেও নিরঞ্জনকে দেখা যায়নি। মৃতদেহ এনে শোয়ানো হলো রায়েদের বিরাট উঠোনের ওপর। কীর্তনীয়ারা নাম সংকীর্তন করতে শুরু করলো। আত্মীয়স্বজনরা হরিধ্বনি দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যেতে

প্রস্তুত হলো। সকলে বললো সুজিতবাবুকেই প্রথম মৃতের খাট স্পর্শ করতে। ওদিকে উঠোনের রোয়াকের ওপর মেয়েদের ভিড় জমেছে—সেখানে নির্মলা দেবী আর মাধুরী বার বার জ্ঞান হারাচ্ছে। তাদের নিয়েই মেয়েরা ব্যস্ত। বিরাট উঠোনের চারধার একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সুজিতবাবু আমার বাবাকে প্রশ্ন করলেন—খোকা কোথায় গেল, খোকা? কাজের চাপে বাবারও সে কথা খেয়াল ছিল না। অনেক খোঁজার পর নিরঞ্জনকে পাওয়া যায় নাকি তার পড়ার ঘরের মধ্যে। দরজা বন্ধ করে সে যে কি করছিল তা সেই জানে।

*

* *

মালতী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে খুব বেশী একটা কথা নিরঞ্জন বলতো না। বাড়ির সব ব্যাপারেই কেমন যেন সে উদাসীন থাকতো। কেউ কথা বললে সে কথা বলতো—নইলে নিজের ব্রেল বই বা বেহালা, পিয়ানোর ওপর সুর সৃষ্টি করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতো।

এমনি যখন তার মনের অবস্থা, তখনই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো বাসন্তীর। নাম, যশ কিছুরই অভাব ছিল না তার। কিন্তু তবু সে অনুভব করতো, এ পৃথিবীতে বড় একা সে। তাই বাসন্তীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তার মনে লাগলো দোলা। ভবানীপুরে বাসন্তীকে নামিয়ে দিয়ে এসে অকারণেই গাড়িতে বসে গুনগুন করে গান গেয়েছিল। বাড়িতে এসে নিজের ঘরে বসেই সে শুরু করেছিল গাইতে—

"পরবাসী চলে এসো ঘরে"...

কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে যে তার মনের বীণায় সুর ধ্বনিত হয়েছিল তা হয়তো সেদিন সে নিজেই বোঝেনি। পরের দিন নিরঞ্জন কলেজে

গেল বরং দশ মিনিট আগে। কিন্তু কই, বাসন্তী তো তার সঙ্গে কথা বলছে না। সে কী অধীর প্রতীক্ষা! কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না—বাসন্তী কলেজে এসেছে কি না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। কিন্তু তবুও মন তো মানতে চায় না। ঢংঢং করে ঘণ্টা পড়লো, ক্লাস শুরু হলো। নিরঞ্জনের মনে হলো বিধাতার কাছে কোন্ অপরাধ করেছিল সে যার জন্যে আজ সে দৃষ্টিহীন হয়ে আছে। এই ঘরের মধ্যে বাসন্তী আছে কি না, সেটুকু দেখবার অধিকারও বুঝি তার নেই। কাল আলাপের সময় বাসন্তীর রোল নম্বরটা জেনে নেওয়া হয়নি। তাই আজ রোল নম্বর ডাকার সময় বাসন্তীর উপস্থিতি বোঝা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। নিরঞ্জনের মনে হলো বাসন্তীটা কি নিষ্ঠুর! কেন তার সঙ্গে কথা বললো না ঘণ্টা পড়বার আগে! রোল নম্বরটা বলে দিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হতো! চিন্তার উত্তেজনায় নিরঞ্জন একবারও ভাবলো না, এ রোল নম্বর জেনে নেওয়ার কাজটা হচ্ছে তার।

যা হোক ভুল যখন হয়ে গেছে, ফল তার ফলবেই। আজ অকারণেই ঘণ্টাটাকে দীর্ঘ বলে মনে হয়। ঘণ্টাটা যেন শেষই হতে চায় না।

প্রফেসর পড়িয়ে যাচ্ছেন, নিরঞ্জনের সেদিকে মনই নেই। সে সেই সময়ে ভেবে চলেছে বাসন্তীর মিষ্টি গলার আওয়াজের কথা।

তার খানিক পরিচয়ের মধ্যে সেই আত্মীয়তাপূর্ণ কথাগুলো, যা সত্যি নিরঞ্জনের মনে একটা দাগ রেখে গেছে।

অবশেষে ঘণ্টা শেষ হলো। ছেলের দল হৈহৈ করে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেল। গেল না কেবল নিরঞ্জন। ক্লাসে বসে চুপচাপ করে সে একটা বইতে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মন বসে না। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায় বাসন্তীর কথা।

এমনি সময় হঠাৎ আবার সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর। বাসন্তী প্রশ্ন করে—আজ আপনি কমন রুমে গেলেন না যে?

—কমন রুমে?—নিরঞ্জন চুপ করে কি যেন ভেবে নেয়।

কাল সন্ধ্যে থেকে নিরঞ্জনের মনের মধ্যে যে সুর গুঞ্জরিত হচ্ছিল, তা যেন হঠাৎ থেমে গেল। কাল রাত্তির থেকে বাসন্তীকে বলবার জন্যে যে সমস্ত কথা নিরঞ্জন ভেবে রেখেছিল, অভিশপ্ত কর্ণের মত নিরঞ্জন যেন তা বলবার সময় ভুলে গেল। কেবল ঢোক গিলে বললো —এমনি যাইনি।

বাসন্তীর বিরুদ্ধে তার মনের মধ্যে যে অভিযোগ জমা হয়েছিল তা যেন কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল।

বাসন্তী এবার প্রশ্ন করে—কাল রাত্রে খুব কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই?

নিরঞ্জন বলে—কষ্ট কিসের?

—এই আমাকে এতখানি পৌঁছে দিতে হলো!

নিরঞ্জন এইবার যেন কথার ফাঁকে একটা রহস্য করবার সুযোগ পেয়ে বলে—আমি তো আর আপনাকে ঘাড়ে করে পৌঁছে দিইনি! সেই জন্যে কষ্টও হয়নি।

নিরঞ্জনের কথা শুনে বাসন্তী হেসে ফেলে। বলে—না তা হয়নি বটে, আপনারা বিরাট বড়লোক, আপনার বাবার গাড়ি আছে, তাইতেই আপনি আমায় পৌঁছে দিয়েছেন।

নিরঞ্জন বলে—তাহলে বুঝতেই পারছেন যে গাড়ি আমার নয়। আর বড়লোক? আমার বাবা হতে পারেন—আমি তো নই—

বাসন্তী বলে—কেন, নন কিসে? বাপ বড়লোক হলে ছেলে কি বড়লোক হয় না?

নিরঞ্জন বলে—না বাসন্তী দেবী, তা হয় না।

আবার প্রশ্ন হয়—কেন?

উত্তরে শুধু নিরঞ্জন বলে—সে প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এখনও হয়নি।

এর পরে প্রায়ই হেদোতে এবং ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের পাশে ওদের দু'জনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যেত। কিন্তু সন্ধ্যা হবার আগেই বাসন্তীকে কোথাও পৌঁছে দিয়ে নিরঞ্জন ফিরে আসতো নিজের বাড়িতে।

পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে কখন যে তারা পরস্পরের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তা হয়তো তারা দু'জনের কেউই বুঝতে পারেনি! 'আপনি' তখন পর্যবসিত হয়েছে 'তুমি'তে। কিন্তু এত কাছাকাছি দাঁড়িয়েও নিরঞ্জনের মনে হতো, সে বাসন্তীর নাগাল পাচ্ছে না। তার কেবলই মনে হতো, তার অন্ধকার জীবনরাত্রের মধ্যে বাসন্তী যেন আলেয়ার আলো। তাকে দেখা যায়, অনুভবের গণ্ডীর মধ্যেও আনা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না।

ওদিকে বাসন্তী আর নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে ছেলেমেয়েদের মধ্যেও শুরু হয়েছে কানাকানি। মেয়েরা বাসন্তীকে বলে—শেষকালে একটা কানার প্রেমে পড়লি? তোর এত সুন্দর রূপ সে কোনও দিনই দেখতে পাবে না?

বাসন্তী মুখ গম্ভীর করে থাকে, তাদের কথার জবাব দেয় না।

অপর দিকে ছেলেরা নিরঞ্জনকে বলে—ব্রেভো নিরঞ্জন, ব্রেভো! ইউ হ্যাভ সিকিওরড বেস্ট ফিশ্ আউট অব্ দি লট্।

বন্ধুবান্ধবের হাসি-তামাশার মধ্যে নিরঞ্জন এইটুকু বুঝতে পারে, আর যাই হোক বাসন্তী অপরূপ সুন্দরী।

বাসন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বহু ছেলেই বাসন্তীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। দু'চারটে প্রেমের ইঙ্গিত যে তারা জানায়নি তাও নয়, কিন্তু বাসন্তীর কড়া চোখের চাহনির সামনে তারা কেউই দাঁড়াতে পারেনি।

এই সব ছেলেদের মধ্যে অগ্রণী ছিল অলকেশ। নিরঞ্জন ক'দিন

কলেজে আসছে না, লাহোরের একটা গানের জলসায় সে গিয়েছে। তাই দুপুরবেলাটা বাসন্তী একা একা, কলেজের কম্পাউণ্ড বা হেদোতে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলে না।

সেদিন দুপুরে বসে সেদিনের কাগজখানা সে মন দিয়ে পড়ছিল। দৈনিক সংবাদপত্রে সেদিন প্রকাশ হয়েছিল নিরঞ্জনের একটা বিরাট ছবি। সম্পাদকমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত হয়ে তার প্রশংসা করেছেন। একমনে পড়াটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীর বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস। হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়ে। পেছন থেকে কে যেন তার আঁচল ধরে টানতে থাকে। খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়ে বাসন্তী পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে চায়। বলে—একি, অলকেশবাবু যে!

অলকেশ বলে—তবুও যাহোক চিনতে পেরেছেন!

—চিনতে না পারার কোনও কারণ ঘটেনি তো!

—নিশ্চয়ই ঘটেছে! কথাটা শেষ করে অলকেশের মুখে ফুটে ওঠে বিদ্রূপের হাসি। অলকেশ যে কি ইঙ্গিত করতে চায় তা বাসন্তীর কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু তবুও বাসন্তী না বোঝবার ভান করে বলে—আমার অজানতে যদি কোন কারণ ঘটে থাকে, তা হলে আমি কি করে জানব অলকেশবাবু?

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে, তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিতে নিতে অলকেশ বলে—স্রেফ মোটরগাড়ি আর বড়লোকের ছেলে দেখেই ভুলে গেলে? আমি তোমার বাড়ির কাছে থাকি। না হয় আমি অত বড় গাইয়ে নই, তাই বলে কি করুণার এতটুকু দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়বে না?

গত বছর বাসন্তীরা উঠে এসেছে অলকেশদের পাড়ায়। বই খাতা নিয়ে কলেজ যাবার সময় কোঁচা দুলিয়ে, হাতে খাতা নিয়ে অলকেশকে কতদিন সে কলেজ যেতে দেখেছে। অলকেশ এবং তার

সঙ্গীরা বাসন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতেও দ্বিধা করেনি। প্রথমটা বাসন্তী এদিকে মন দিত না, কিন্তু মন দিতে বাধ্য হলো যখন রাস্তায় তার গায়ে এসে লাগলো তারই নাম লেখা একখানা বন্ধ খাম। চিঠিখানা পড়ে বাসন্তী বুঝতে পারে সেটা অলকেশেরই হাতের লেখা। এর পরে তাকে ডেকে বাসন্তী একদিন জানিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে সে যদি ওভাবে তাকে অপমান করবার চেষ্টা করে, তা হলে আত্মরক্ষার জন্যে অপরের সাহায্য নিতে বাসন্তী কুণ্ঠিত হবে না। এর পরে অত্যাচারের মাত্রা কিছু কমে। বাসন্তী মনে মনে প্রমাদ গনে। ছাড়বার উপায়ও নেই। কলেজে বাসন্তী পড়ে হাফ ফ্রীতে। হেডমিসট্রেসের রেকমেণ্ডেশনের জোরেই বাসন্তী এই হাফ ফ্রীশিপটা যোগাড় করেছিল। অলকেশও বাসন্তীকে কলেজে নিজের শ্রেণীতে দেখে প্রথমটা আশ্চর্য হয়েছিল। মাসখানেক না যেতে যেতে অলকেশের অত্যাচার আবার শুরু হয় বাসন্তীর ওপর। এবারেও তার সঙ্গে আছে কলেজের আরও কয়েকটি ছাত্র। দুর্নামের ভয়ে বাসন্তী ব্যাপারটা কলেজের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করেনি। নীরবে মুখ বুজে সে অলকেশের অত্যাচার সহ্যই করে যাচ্ছিল।

তাই কমন রুম বা লাইব্রেরি, কোথাও বাসন্তীকে দেখা যেত না। লিজার পিরিয়ডে বাসন্তী কোনও খালি ক্লাসে বা কোনও বন্ধুর সঙ্গে কলেজের পার্কে বেঞ্চিতে বসে কাটিয়ে দিত। বাসন্তী বুঝতো, তার 'কটা' চামড়ার জন্যই অলকেশ বা ঐ জাতীয় ছেলের দৃষ্টিপথে সে পড়েছে। তাই সে যতদূর সম্ভব নিজের বেশভূষার পারিপাট্য এড়িয়ে চলতো। এমনি যখন তার মানসিক অবস্থা তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায় নিরঞ্জনের। নিরঞ্জনের গুণে সে মুগ্ধ। তার গানে সে ছিল পাগল। রেডিও বা যে কোনও সাধারণ জলসায় নিরঞ্জনের গান হতো, সেখানেই দেখা যেত বাসন্তীকে। নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কি

করে যে হয়ে গেল তা বাসন্তী জানতেই পারেনি। মেয়েরা বলে, নিরঞ্জনের টাকাপয়সা আর বড়লোকিয়ানার মধ্যে বাসন্তী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। গরিবের মেয়েকে নিরঞ্জন জয় করেছে তার বিশাল মোটর চড়িয়ে। কিন্তু বাসন্তী জানে সে কথা সত্য নয়। নিরঞ্জনের সঙ্গে সে গিয়েছিল নিছক পরিচয় করতে। কিন্তু কখন কেমনভাবে নিরঞ্জন যে তার মনের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে তা সে জানতেও পারেনি।

তার জন্যে সে তো দায়ী হতে পারে না! মন যদি তার হাতধরা হতো তা হলে সে তাকে শাসন করতো। গলা টিপে হত্যা করতেও বোধ হয় দ্বিধা করতো না। কিন্তু তা তো হবার নয়। মন, সে যে চির অবাধ্য। কখন যে সে নিরঞ্জনকে সম্রাটের আসনে বসিয়েছে তা সেই জানে। আজ তাই শত কুৎসা, শত উপেক্ষা, শত বিদ্রূপ তার প্রাপ্য, কিন্তু সে যে বড় অসহায়! রাতের বেলায় নিজের বিছানায় শুয়ে এরই জন্য সে মনকে কত শাসন করেছে। কতবার ভেবেছে, এ তার অন্যায় আবদার, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার অপচেষ্টা মাত্র। কতবার কলেজে বেরুবার সময় প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছে, নিরঞ্জনের সঙ্গে সে আর কথা বলবে না। কিসের সম্পর্ক তার সঙ্গে নিরঞ্জনের! কিন্তু ক্লাসে, নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাইতেই সে ভুলে গেছে তার প্রতিজ্ঞার কথা। সোনার ফ্রেমে আঁটা কালো কাঁচের চশমা ঢাকা নিরঞ্জনের মুখের ওপর দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে নিরঞ্জন কত অসহায়।

বাসন্তী ঘরে থাকা সত্ত্বেও সে জানতেও পারবে না তার উপস্থিতির কথা। তাই তো লিজার পিরিয়ডে বা ছুটির সময় যখনই নিরঞ্জনের বেয়ারা এসে ডেকেছে তাকে, তখনই সে ছুটে গেছে নিরঞ্জনের পাশে। প্রত্যাখ্যান করে নিরঞ্জনকে দুঃখ দিতে সে পারেনি।

অলকেশ সিগারেটে দু-তিনটে টান দিয়ে বলে—কথার উত্তর দিচ্ছ না যে? বলি, আমাদেরও কিছু বল!

—কী বলব অলকেশবাবু?

অলকেশ এবার হেসে বলে—বলবার কি কিছুই নেই! না হয় আমাদের মোটরগাড়িই নেই, তাই বলে কি আমরা এতটা উপেক্ষণীয়?

বাসন্তী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—অলকেশবাবু, আপনার অন্য কোনও দরকার যদি থাকে তো বলুন, তা না হয় আপনি যেতে পারেন।

এতখানি অপমানের জন্যে অলকেশ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়—অত তেজ দেখিও না বাসন্তী! জানা আমার সবই আছে। হাটের মাঝখানে শেষকালে হাঁড়ি ফাটবে? আর তুমি যা করে বেড়াচ্ছ, তা তোমার মত মেয়েরাই পারে।

অলকেশ আশা করেছিল, এ কথাতে বাসন্তীর সুর নরম হবে। কিন্তু হলো তার উলটো। বাসন্তীর বড় বড় টানা টানা চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হয়ে আসতে চায়। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি অলকেশের মুখের ওপর স্থাপন করে সে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—অলকেশবাবু, হতে পারি আমি গরিব, কিন্তু আমি খালি পায়ে চলি না। আমার পায়ে সদাসর্বদা একটা স্যাণ্ডাল থাকে দেখেছেন তো? প্রয়োজন হলে সেটা স্থানচ্যুতও হতে পারে। এবং আমার আত্মরক্ষার কাজেও ব্যবহার করতে পারি। —কথা শেষ করে বাসন্তী সেখান থেকে চলে যায়। অলকেশের দল বাসন্তীর সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বাসন্তী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ অলকেশের মুখে কোনও কথা ছিল না। জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিতেও সে ভুলে গিয়েছিল। আপনাআপনি জ্বলে সেটা কখন নিভে গেছে তা অলকেশের খেয়ালই ছিল না।

ঘটনার আদ্যোপান্ত উপলব্ধি করে অলকেশের মুখ থেকে হঠাৎ

বেরিয়ে আসে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, তুমি কি করে এই কলেজে পড়!

মজা দেখবার জন্যে অলকেশের সঙ্গীরা যারা এতক্ষণ আড়ালে অপেক্ষা করছিল, তারা সকলে মিলে হেসে ওঠে।

এর কিছুদিন পরে নিরঞ্জন ফিরে এলো লাহোরের গানের জলসা থেকে। সেবারে সমস্ত ভারতবর্ষের সংগীতশিল্পীরা স্বীকার করে নিয়েছেন, নিরঞ্জনের মত শ্রেষ্ঠ গায়ক তখন ভারতবর্ষে অতি অল্পই আছে। আর বাঙলাদেশে? তার জুড়ি মেলা ভার। নিরঞ্জনের কাপ, মেডেল, যা কিছু সে বাইরে থেকে অর্জন করে নিয়ে এসেছিল, তা নিরঞ্জন কলেজে যোগ দিতেই অধ্যক্ষ মহাশয় দেখতে চাইলেন। এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা সংবর্ধনা সভা করে তিনি নিরঞ্জনকে সম্মানিত করলেন। কিন্তু এত পেয়েও নিরঞ্জনের মন ভরলো না। কারণ সে আশা করেছিল, তার এই জয়ে বাসন্তী গর্ব অনুভব করবে। বাসন্তী তাকে বলবে পুরনো সেই বহু-শোনা কথাটা—নিরঞ্জনবাবু, আপনি কত বড় গাইয়ে!

কিন্তু কোথায় বাসন্তী! প্রথম দিন সে মনে করেছিল বাসন্তী বুঝি অসুস্থ তাই কলেজে যোগ দেয়নি। কিন্তু সংবর্ধনা সভার দিন আর থাকতে না পেরে সে অলকেশকে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা ভাই অলকেশ, বাসন্তীর কোনও খবর জানো?

অলকেশ অম্লানবদনে বলে—জানি বইকি!

একটু উৎসাহিত হয়েই নিরঞ্জন প্রশ্ন করে—কি হয়েছে তার? তাকে কলেজে দেখছি না ক'দিন?

অলকেশ গম্ভীর হয়ে বলে—আর বোধ হয় কোনও দিনই দেখবে না।

একরকম বিস্মিত হয়ে গিয়েই নিরঞ্জন বলে—তার মানে?

অলকেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সে খবর তোমার না শোনাই ভাল নিরঞ্জন।

কিন্তু নিরঞ্জনের কৌতূহল এতে বেড়েই যায়।

অবশেষে অলকেশ বলে—একান্তই যখন শুনবে তখন শোন। বাসন্তী আমাদেরই পাড়ায় থাকতো। তাই বাসন্তীর সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার জানা আছে। কথাটা অনেকবারই ভেবেছি, তোমাকে বন্ধু হিসেবে বলা দরকার। কিন্তু কি করব, চক্ষুলজ্জার খাতিরে তোমায় কোনও কথা জানাতে পারিনি।

নিরঞ্জন বলে—কেন জানাতে পারোনি ভাই অলকেশ?

অলকেশ এবার যেন একটু ব্যথিত হয়ে বলে—পৃথিবী থেকে সব আনন্দই তোমার চলে গেছে। বাসন্তীর সঙ্গে একটু মিশে তুমি যদি আনন্দ পাও, আমি তাতে বাধা দিই কেন। আর যা সত্য, তা তো একদিন প্রকাশ পাবেই। আশা করেছিলুম তোমার সংস্পর্শে এসে বাসন্তী হয়তো নিজেকে বদলাতে পারবে।—কথা শেষ করে অলকেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

একরকম বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন বলে—কিন্তু সত্যটা কি, তা তো এখনও বললে না।

অলকেশ বলে—যা হয়ে থাকে নিরঞ্জন। আমাদের পাড়ার একটি বড়লোক ছেলের সঙ্গে বাসন্তীর অনেকদিনই মেলামেশা চলছিল। আজ ক'দিন হলো তারা কোথায় পালিয়ে গেছে। পুলিস খোঁজাখুঁজি করছে, কিন্তু খবর কিছুই পাওয়া যায়নি।

প্রায় আচমকাই নিরঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—বাসন্তী পালিয়ে গেছে? এও কি সম্ভব?

অলকেশ তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে—জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, তবুও এই সম্ভব।

কথা বাড়াতে আর নিরঞ্জনের ইচ্ছে হয় না। অলকেশদের সঙ্গ

একরকম জোর করে এড়িয়েই সে গিয়ে বসে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জন জায়গায়। কলেজ, কমনরুমের হাসিঠাট্টা, গান, গল্প তার কাছে কিছুই তখন ভাল লাগছে না। সারা জগৎটা যেন তার কাছে এক মহাশূন্যে পরিণত হয়েছে। সেখানে যেন আলো নেই, বাতাস নেই, প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারে না মানুষ। মন থেকে কে যেন বলে ওঠে—কেন তুমি আমার এই ক্ষতি করলে বাসন্তী? অন্য ছেলেদের মতন আমি তো প্রথমে তোমার প্রেমাসক্ত হইনি। তুমি নিজে যেচে কেন আমার সঙ্গে পরিচয় করলে? কেন তোমাকে পাবার দুর্জয় আশা আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললে?

নিরঞ্জনের মনে হয় সারা পৃথিবী আজ তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ তাকে চায় না। কেউ ভালবাসে না। অন্ধ বলে, এই বিশাল পৃথিবীতে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবে তার উপায় নেই। কুকুরের গলায় শিকল টেনে, তার ইচ্ছার-বিরুদ্ধে পরিচালনা করে মানুষ যেমন আনন্দ পায়, সারা জগতের লোক ঠিক তাকে নিয়েও তেমনি আনন্দ যেন উপভোগ করতে চাইছে। তার সংবর্ধনা সভা, কলেজ, সব কিছু ছেড়ে তার চলে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারে না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। অথচ বাসন্তীর বিশ্বাসঘাতকতায় সারা জগৎ উঠেছে তার কাছে বিষিয়ে।

নিরঞ্জনের যখন মনের এইরকম অবস্থা, ঠিক এমনি সময় যেন তাকে বিরক্ত করতেই তার গা ঘেঁষে এসে বসে কমল। বলে—আজকে তোমাকে নিয়ে কলেজের সভা। অর্থাৎ তুমি আজ hero of the day. বিকেলবেলায় একটা কড়া দেখে গান শোনাচ্ছো তো মাইরি! তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই খানিকটা হেসে নেয়। জ্বলন্ত সিগারেটে আরও গোটাকতক টান বসিয়ে দিয়ে বলে—রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতায় পড়েছি হ্যামেলিন শহরের বাঁশিওয়ালা এমন বাঁশি বাজিয়েছিল যে ছেলেমেয়ে মায় ইঁদুরের দল অবধি ভুলে গেল

পাহাড় ফাঁক হয়ে গেল। আর আমাদের দেশের কেষ্ট ঠাকুরের বাঁশির কথা কে না জানে। শালা, অত গোপিনী, সব একসঙ্গে ভুলে গেল! একটা ছিটেফোঁটা রইলো না অন্য কারুর জন্যে। আর তুমি! বাঁশি নয়, স্রেফ সুরের জালে সকলকেই ভোলালে বাবা! মেয়েরা তো ছারখারে গেল, গোঁফ নিয়ে আমি পর্যন্ত ভোলবার উপক্রম—বলে প্রাণ খুলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

নিরঞ্জন হাসবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। হারানো ব্যথায় তার সারা বুকটা যেন টনটন করে উঠলো। কলেজে আসার প্রথম দিন থেকেই কমলের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। অন্য ছেলেদের চেয়েও কমলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব যে ঘনিষ্ঠভাবে হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শেষের কয়েক মাস, বাসন্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বে যেন একটু ভাটা পড়েছিল, তাই আজ কমলের আত্মীয়তাপূর্ণ কথা শুনে প্রথমটা তার মনে হয়েছিল, কমলও বুঝি তার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করতে এসেছে। কিন্তু সে ভুল তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে গেল। নিরঞ্জন বলে—আমার গান শুনে আর কে ভুলবে ভাই! ওই তোমার মতন দু'একজন গোঁফওয়ালাই ভুলতে পারে। মেয়েরা আমার গানের পরোয়াও করে না!—কথাটা হাসির ছলে বলতে গিয়েও নিরঞ্জনের কণ্ঠ থেকে এমন একটা সুর বেরিয়ে এলো যার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নিরঞ্জনের মনে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়েছে।

কমল বোধ হয় এই রকমই একটা কিছু আশা করছিল। তাই বলে ওঠে—কি হয়েছে ব্রাদার? মনটা ভাল নেই কেন? ভারত-বিখ্যাত গাইয়ে তুমি, তোমার গানে লোক ভুলবে না! আরে আর কেউ না ভুলুক তোমার গানে আমি ভুলেছি আর ভুলেছে তোমার একনিষ্ঠ পূজারিনী বাসন্তী দেবী।

নিরঞ্জন বলে—তুমি হয়তো ভুলেছ কিন্তু বাসন্তী তো ভোলেনি।

—ভোলেনি মানে! কোলকাতা শহরে যেখানে তুমি গান গাও, সেই সমস্ত আসরেই তো বাসন্তীকে দেখা যায়। আর তা ছাড়া —তার সঙ্গে কয়েক মাস মিশেও কি মনের কথা বুঝতে পারলে না! নাও একটা সিগারেট ধরাও। একটা টান মারলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। নয়তো চলো, পাশের ওই রায়মশায়ের রেস্টুরেন্টে,—বলে, একরকম জোর করেই নিরঞ্জনকে নিয়ে সে টানতে টানতে হাজির হয় রেস্টুরেন্টে।

নিরঞ্জন বলে—না ভাই, আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে কমল বলে—না লাগবারই কথা, তোমার বাসন্তী থাকলে—

কথা শেষ হবার আগেই একরকম প্রতিবাদের সুরেই নিরঞ্জন বলে —বার বার 'আমার বাসন্তী' বলছ কেন?

—বলছি কেন? তোমার সঙ্গে মেশার জন্যে অলকেশের দল তাকে কিভাবে বিদ্রূপ করেছে তার খবর রাখ? সে হাসিমুখে সব সহ্য করেছে। তোমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অলকেশ গিয়েছিল তাকে অপমান করতে। উলটে নিজে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। তবে হ্যাঁ, কেন যে সে কলেজে আসছে না ক'দিন ধরে, বুঝতে পারছি না। বোধ হয় অসুখবিসুখ করেছে! আর তুমি! তার না-আসার কারণ না জেনেই একটা কল্পনার জাল বুনে তার ওপর অবিচার শুরু করে দিয়েছ। একেই বলে বড়লোকের খেয়াল!

নিরঞ্জন এতক্ষণ কমলের কথাগুলো গিলছিল। সে বলে—তবে যে অলকেশের মুখে শুনলাম অন্য কথা!

একটা হাসির আবেগে ফেটে পড়ে কমল বলে—অলকেশকে বুঝি বাসন্তীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলে? আরে ও "ডন জুয়ান"টার কথায় কোনও সত্য আছে নাকি? আজ দু'তিন বছর ধরে আই. এ.

পাস করতে পারছে না! পড়াশুনায় মন নেই। মেয়েছেলে দেখলেই তার সঙ্গে প্রেম করতে ছুটে যায়। এর ওর পয়সায় সিগারেট খেয়ে বেড়ানোই যার অভ্যেস, তার আবার কথার কি দাম!

ততক্ষণে বয় এসে দু'জনের সামনে চায়ের কাপ রেখে গেছে। নিরঞ্জনকে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়ে কমল বলে—শুনেছ অলকেশের ambition! বলে, film director হবো। নিখিলেশ বড়ুয়া নাকি ওকে বলেছে—I. A.-টা পাস করতে পারলেই তোমাকে আমার assistant করে নেব।—বলে, আবার কমল হাসতে থাকে।

নিরঞ্জনের মনের মেঘটা তখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। একথা সেকথার পর নিরঞ্জন বলে—বাসন্তী কোথায় থাকে জান ভাই?

আমতা আমতা করে কমল বলে—তা তো ঠিক বলতে পারি না, তুমি জানো না? রোজ তো তাকে গাড়ি করে কোথায় পৌঁছে দিতে।

নিরঞ্জন বলে—সে তো এক জায়গায় কোনওদিন নামেনি। কোনওদিন শ্যামবাজারে, কোনওদিন ভবানীপুরে, কোনওদিন বা বউবাজারের কোথাও গাড়ি থেকে নামতো। কতবার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছি।

কমল সাগ্রহে প্রশ্ন করলো—কি বলেছে সে?

নিরঞ্জন বলে—সেই একই কথা। "আমার বাড়ি আপনার মতন লোকের যাবার উপযুক্ত স্থান নয়"।

একটু ভেবে কমল বলে—সে যেখানে যেখানে নামতো তোমার ড্রাইভার নিশ্চয় সে জায়গাগুলি চেনে। আজকে তোমার সংবর্ধনার পর, সেই সমস্ত জায়গায় আমি নিজে তোমার সঙ্গে গিয়ে খোঁজ করব। একটা হদিস পাওয়া যাবেই যাবে। যা হোক, এখন চলো যাওয়া যাক, কলেজে মিটিং হবার সময় হয়ে এলো।

*

*   *

কোথায় বাসন্তী! তিন চার দিন ধরে সমস্ত জায়গায় আঁতিপাতি করে খোঁজার পরেও বাসন্তীর কোন সন্ধান তারা পায় না। ড্রাইভারের দেখানো বাড়িগুলোয় গিয়ে কমল অনুসন্ধান চালায়। অনুসন্ধানে জানতে পারা যায় এইটুকু, ওই সমস্ত বাড়িগুলোয় বাসন্তী আসতো টিউশানি করতে। কোথাও বা শেখাতো গান, কোথাও বা শেখাতো সেলাই। কিন্তু তারা কেউই বাসন্তীর প্রকৃত ঠিকানা বলতে পারে না।

বিয়োগব্যথা প্রথমমুখে যত বড় হয়েই দেখা দিক না কেন, কালের প্রভাবে তা বিলীন হয়ে যায়। শেষে অতীতের সঙ্গে মিশে গিয়ে পড়ে থাকে কেবল মানুষের মনে তার স্মৃতি। নইলে মানুষ হয়তো পাগল হয়ে যেত। ব্যথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যই বোধ হয় সৃষ্টিকর্তা এই নিয়মের করেছেন রচনা। অবশিষ্ট স্মৃতিটুকুকে নিয়েই মানুষ কখনও কাঁদে কখনও বা হাসে। সেটা তার বিলাস। তাই বাসন্তীর বিরহব্যথা সাময়িকভাবে নিরঞ্জনকে অভিভূত করলেও সেটা কাটিয়ে উঠতে তার দেরি হয় না। কিন্তু মনের মধ্যে বাসন্তীর স্মৃতি হয়ে থাকে চির অক্ষত চির অম্লান।

সুজিতবাবুর সঙ্গে নিরঞ্জনের যেটুকু সম্বন্ধ ছিল, ইদানীং তাও যেন কমতে শুরু করে দিল। কেবল আমার বাবার সঙ্গে নিরঞ্জনের আত্মীয়তা যেন কিছু বেশী মাত্রায় হয়। অবশ্য তার কারণ আমার বাবা কোথাও তাঁর ডায়েরীতে লেখেননি। খুব সম্ভব বাসন্তীর কথা তাঁর জানা ছিল না। আর আমার বিশ্বাস, যদি জানা থাকতো, ভুল করে তিনি নিরঞ্জনকে অতখানি অশান্তির সাগরে ডোবাতেন না।

নিরঞ্জন যে তাঁকে বিশ্বাস করতো, ভালবাসতো এবং হিতৈষী বলে

বিশ্বাস করেছিল, সে কথা তিনি জানতেন। ডাক্তার ঘোষের কাছে নিরঞ্জনের উক্তির মধ্যে এর কারণ কোথাও সে বলেনি। তাই সে কারণ আমাদের কাছে রয়ে গেল চিরঅজ্ঞাত।

যা হোক যা বলছিলাম। আবার ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো—এমনি করেই আসে চিরদিন। নিরঞ্জন মন দিয়ে লেখাপড়া শুরু করে। ভালভাবে আই. এ. পরীক্ষায় পাসও করলো সে। যে কোনও কারণেই হোক, নিরঞ্জন তার পুরনো কলেজ ছেড়ে দিয়ে এসে ভরতি হলো প্রেসিডেন্সী কলেজে।

ইতিহাসে 'অনার্স' নিয়ে সে বি. এ. পড়তে থাকে। এমনি সময় হঠাৎ একটা গানের আসরে কমলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বাসন্তীর।

এই গানের জলসা বসেছিল কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। সভা বসবার বহু আগেই কমল একটা বসবার স্থান করে নিয়েছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে যায় দুটি শ্রেণী আগে উপবিষ্টা বাসন্তীর ওপর।

কমল বাসন্তীকে দেখে বুঝতে পারে, বাসন্তী আর যাই হোক বিশ্বাসঘাতিনী নয়। নিরঞ্জনকে আজও সে ভালবাসে, তাই নিরঞ্জনের নাম খবরের কাগজে দেখেই সে ছুটে এসেছে এই সভায়।

সহসা বাসন্তীকে ডাকতে তার ইচ্ছে হয় না। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার ওরকম ব্যবহার দেখে তার মন ওঠে বিষিয়ে।

বাসন্তীকে ভাল করে বোঝবার জন্যে কমল এসে বসে বাসন্তীর পেছনের সীটে।

ওদিকে মঞ্চের ওপর ঠিক সেই সময়ে নিরঞ্জন এসে শ্রোতাদের জানায় তার অভিবাদন। করতালিধ্বনিতে সারা প্রেক্ষাগৃহ তখন হয়ে উঠেছে মুখর। কমল লক্ষ্য করে নিরঞ্জনকে দেখেই বাসন্তী তার ডান হাতটা সবার অলক্ষ্যে কপালে ছুঁইয়ে জানায় প্রণাম।

কমলের কৌতূহল বাড়তে থাকে। নিরঞ্জন বেহালায় সুর বেঁধে নিয়ে ধরে দরবারী কানাড়ার আলাপ। তার কণ্ঠসংগীত বেহালার

সুরের সঙ্গে মিশে সেখানকার বাতাসকে করে তোলে ভারী। তার গান শুনে তখন মনে হচ্ছিল সত্যিই বুঝি সেই সুর বেরিয়ে আসছে কোনও এক বিরহিণী রমণীর কণ্ঠ থেকে, যে হারিয়েছে তার প্রিয়তমকে প্রথম মিলনের রাত্রে। চিতার ওপর শায়িত দয়িতের জন্যে দয়িতার সে কি আকুল ক্রন্দন! নিজের সমস্ত হৃদয়কে মথিত করে সে উজাড় করে দিতে চায় প্রিয়ার চরণে তার সমস্ত ভালবাসা।

অতীত দিনে কোন্ বিরহী সুরকার এই সুরের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নাম আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে মানুষের কাছে। কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি সেই সুর। বিরহ মূর্ত হয়ে ওঠে এই সুরের মূর্ছনায়। তাই এই বিরহের সুর মানুষের কাছে চিরপরিচিত।

নিরঞ্জনের গানের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। শ্রোতাদের চোখও শুষ্ক ছিল না। উদারা, মুদারা, তারায় তার কণ্ঠস্বরের সাথে সাথে তার হাতের বেহালাটাও যেন গুমরে গুমরে কেঁদে উঠতে লাগলো। খেয়াল গান যে এত প্রাণস্পর্শী হতে পারে, তা নিরঞ্জনের গান না শুনলে বোঝা যায় না।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর তার গান থামিলো। সে বিদায় নিতে চায় শ্রোতাদের কাছ থেকে। বাইরে তখন শুরু হয়েছে ঝমঝম করে বৃষ্টি। ঘড়িতেও বেজে গেছে রাত বারোটা।

শ্রোতাদের অনুরোধে নিরঞ্জনকে আবার ফিরে এসে বসতে হয়, ধরতে হয় বাংলা গান। অতিপরিচিত বিশ্বকবির সেই দুটি গান—

"ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার
দুখের পারাবারে"

আর—"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোনও দান"....

কমলের মনে হয় গান দুটো যেন বাসন্তীর উদ্দেশ্যেই গাওয়া। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে যায় এই কথা ভেবে—বাসন্তীর উপস্থিতি নিরঞ্জন

জানলো কি করে? সেদিনকার সুর আর গানের কথাগুলোর সব কটাই যেন বাসন্তীকে উদ্দেশ্য করে।

ওদিকে বাসন্তী এতক্ষণ নিরঞ্জনের গানে এতই অভিভূত ছিল যে কমলের উপস্থিতি সে জানতেই পারেনি। তাই নিরঞ্জন মঞ্চ থেকে চলে যেতে বাসন্তী তার নিজের আসন ছেড়ে উঠতেই কমলের ডাক শুনে চমকে ওঠে।

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তী বলে—একি কমলবাবু! আপনি কতক্ষণ?

—আমি অনেকক্ষণই এসেছি, বাসন্তী দেবী!

বাসন্তী বলে—ভালই হয়েছে। আমার একটা উপকার করবেন?

—উপকার? কি বলুন তো।

—বিশেষ কিছুই নয়, রাত্তির অনেক হয়ে গেছে, তার ওপর ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে, আমার পক্ষে একা যাওয়া—যদি দয়া করে আমাকে একটু পৌঁছে দেন!

—বেশ চলুন।

তারা দু'জনে বের হয়ে আসে হল থেকে। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ছে। মনে হচ্ছিল যেন প্রকৃতি রুদ্রাণী বেশে আবির্ভূতা হয়েছে পৃথিবীর বুকে। ঘুমন্ত পৃথিবীটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চৌচির করে দেওয়াই যেন তার লক্ষ্য। পুরাতন সব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলে আবার সে নতুন করে গড়তে চায়।

ভাঙা আর গড়া। গড়া আর ভাঙা। এই হলো তার কাজ। তাই বোধ হয় মানুষ প্রকৃতির এই সৃষ্টিরহস্য বুঝতে পেরে ধ্বংসের মধ্যে দেখতে পেয়েছে নতুন সৃষ্টির বীজ। মৃত্যুর মধ্যে দেখেছে সে নব-জীবনের সূচনা।

তারা দু'জনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয় একটা ঢাকা জায়গাতে। কমল বলে—যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে মনে হয় এখুনি

কোলকাতার পথঘাট ভেসে যাবে। তা ছাড়া, এত দুর্যোগে গাড়িও তো পাওয়া মুশকিল। কোথায় থাকেন আপনি ?

বাসন্তী বলে—আমি থাকি খুব বেশী দূরে নয়। আমহার্স্ট রো-তে।

কমল বলে—নিরঞ্জন তো এখন বাড়ি ফিরবে না। আজ ভোররাত্রের শেষ প্রোগ্রামে সে বেহালা বাজাবে। ওর গাড়িটা এইখানে কোথাও আছে। ডেকে এনে আপনাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব ?

একরকম চমকে উঠেই বাসন্তী বলে—না, না কমলবাবু, অমন কাজও করবেন না! তা হলে সে জানতে পারবে আমার কথা। তার দরকার নেই। একটু অপেক্ষা করুন। বৃষ্টি থামবেই—তখন যে করে হোক আমরা যেতে পারব।

কমল একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েই বলে—আপনি আপনার উপস্থিতি তাকে জানাতে চান না ?

কাঁপা কণ্ঠে বাসন্তীর কাছ থেকে জবাব আসে—না।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল বাসন্তী। রাত্রের স্বল্পালোকে বাসন্তীর মুখ দেখতে পায় না কমল। কিন্তু তবুও যেন তার মনে হয় বাসন্তীর চোখে জল। সেটাকে বোধ হয় গোপন করতেই সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

কমলের আশ্চর্য লাগে বাসন্তীর ব্যবহারে। কিন্তু প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যেই বুঝি সে অন্য কথা তোলে। বলে—নিরুর গান কেমন শুনলেন ?

বাসন্তী বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, কথার জবাব দিল না। প্রায় দশ-পনর মিনিট এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর বৃষ্টি খানিকটা কমে আসে।

কমল বাসন্তীকে বলে—আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি দেখি

রিক্‌শা পাওয়া যায় কিনা।—কথা শেষ করে উত্তরের প্রত্যাশা না করেই কমল চলে যায় সেখান থেকে।

প্রায় মিনিট কুড়ি আরও খোঁজাখুঁজির পর একটা রিক্‌শা ডেকে এনে কমল দেখে বাসন্তী তখনও পাথরের মূর্তির মত একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বাসন্তীকে উদ্দেশ করে কমল বলে—শুনছেন, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও একটার বেশী রিক্‌শা যোগাড় করতে পারলাম না। বৃষ্টি বাইরে এখনও পড়ছে। রাস্তায় জলও দাঁড়িয়েছে। এখন কি করা যায় বলুন তো?

একটু বিস্মিত হয়েই বাসন্তী বলে—কেন, আপনি তো গাড়ি পেয়েছেন বললেন।

গায়ের জলটা একরকম ঝেড়ে নিতে নিতেই কমল বলে—তা হলে আপনি একা যাবেন তো?

বাসন্তী বলে—কেন, আপনার কি আমার পাশে বসে যেতে কোনও আপত্তি আছে?

—আপত্তি আমার কিছু নেই।

বাসন্তী বলে—তা হলে আর দেরি করবেন না, কাল ছটাতেই আমাকে আবার কাজে বেরুতে হবে। ওদিকে রাতও দেড়টা বেজে গেল।

কথা শেষ করে প্রথমে বাসন্তী, পরে কমল গিয়ে রিক্‌শায় ওঠে। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করে নিয়ে ঠুনঠুন করে রিক্‌শাওয়ালা গাড়ি ছেড়ে দিল।

কারুরই মুখে কোনও কথা ছিল না। অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। রাস্তার কুকুরগুলো জল হয়ে যাওয়ার দরুন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে গৃহস্থের দরজায় বা রোয়াকে। সব গৃহস্থদের জানলা দরজা বন্ধ। রাস্তায় যারা শুয়ে থাকে তারাও আজ হয়েছে আশ্রয়চ্যুত। সে জায়গায় স্থান করে নিয়েছে বৃষ্টির জল।

সেই ঘুমন্ত গোলদীঘির ধার দেখলে মনেও হবে না, দিনের বেলা এর চেহারা বদলে হয়ে যায় অন্য রকম। কেবল নামের জন্যেই জানা যায় দিন আর রাতে স্থানটা একই।

কমল লক্ষ্য করে, ভিজে যাওয়া সত্ত্বেও বাসন্তী গাড়ি থেকে মুখ বার করে একদৃষ্টে ইনস্টিটিউটের দিকে চেয়ে ছিল। কী যে সে সেখানে দেখছিল, তা সেই জানে। তার পরে গাড়ির মোড় ঘুরতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পরে কমলকে উদ্দেশ করে বলে—এই রাত্তিরবেলায় বেশ খানিকটা আপনাকে বিপদে ফেললাম দেখছি!

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বালিয়ে তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে কমল বলে—না বিপদ আর কি! আমি তো আজ রাত্তিরটা জাগবই!

—কি করতেন এই সময়টা?

—শুনেছিলুম আজকে শেষ রাত্রে নিরুর সঙ্গে ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ আল্লাজান তবলা সংগত করবেন। অতবড় বাজিয়ে তো ভারতবর্ষে আর নেই। তাই ওরা যখন প্রাকটিস করতো তাই দেখতাম।

একটু যেন সচকিত হয়েই বাসন্তী বলে—আপনার বন্ধু আপনাকে খোঁজ করবেন না তো?

—করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে।

—তিনি জিজ্ঞেস করলে আপনি কি বলবেন?

একটা পরিহাসের সুযোগ পেয়ে কমল বলে—বলব আপনাকে পৌঁছুতে গিয়েছিলাম। আপনার বাড়ি দেখে এসেছি।—বলে কমল নিজের মনেই হেসে ফেলে।

বুকের কান্নাটাকে প্রাণপণে চাপতে চাপতে বাসন্তী বলে—দোহাই আপনার, অমন কাজও করবেন না। তা হলে ও হয়তো গানের

আসর ছেড়ে, মানমর্যাদা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, সব কিছু উপেক্ষা করে, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসবে আমার কাছে। তখন? তখন কী হবে?

কথা বলতে বলতে বাসন্তীর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে।

কমল স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বলে—নিরুর সঙ্গে ওভাবে ব্যবহার করার জন্যে আপনার ওপর আমিও বিরক্ত হয়েছিলাম। আজ দেখছি ভুলই করেছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বাসন্তী দেবী যে, নিরুকে অতখানি ভালবেসে আপনি কেন এতখানি দূরত্বের সৃষ্টি করলেন? সে তো আপনাকে কাছে পেলে সুখীই হতো।

চোখের জলটা মুছে ফেলে বাসন্তী বলে—সে কথা জানি বলেই তো আমাকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে। অমন করে নিরুকে কোনও কথা না জানিয়ে কলেজ ছেড়ে আসার দরুন, আমি নিজের ওপর কম বিরক্ত হইনি। শুধু তাই নয়, আমার শাস্তিও কি নিরঞ্জনের চেয়ে কোনও অংশে কম হয়েছিল? সেদিন ভেবেছিলুম নিরু সংগীতজ্ঞ, নিরু বিদ্বান্, তার ওপর সে বড়লোকের ছেলে—আমার মতন মেয়েকে ভুলতে তার দেরি হবে না। কিন্তু আজ দু'বছর পর তার গান শুনে বুঝতে পেরেছি কার ওপর অভিমান করে সে এমন গান গাইলো। আজও সে আমাকে ভুলতে পারেনি। বড় ছেলেমানুষ সে। শিশুর মতনই সরল। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত ভবিষ্যৎ কিছুই সে ভাবতে পারে না। আমার কথা জানতে পারলে, অসহায়ের মত আমাকে বলবে—বাসন্তী, অমন করে আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তখন আমি কি করব?—আবার বাসন্তীর চোখে জল দেখা যায়।

কমল বলে—শুধু শুধু ফেরাবেনই বা কেন?

বাসন্তী বলে—সে প্রশ্নের জবাব দেবার সময় এখনও বুঝি হয়নি।

কথায় কথায় গাড়ি সুকিয়া ষ্ট্রীট পার হয়ে গিয়েছিল। আমহার্স্ট রো-র মুখের কাছে আসতেই বাসন্তী তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। কমলকে একটা নমস্কার করে বলে—অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

একরকম চমকে উঠেই কমল বলে—আপনাকে বাড়ি অবধি রেখে আসব না?

বাসন্তী বলে—তার আর প্রয়োজন হবে না, বাকী রাস্তাটুকু আমি একাই যেতে পারব।

কমল বোঝে, তার সঙ্গে গিয়ে, তার বাড়িটা দেখে আসা বাসন্তী চায় না। তাই উপায়ান্তর না দেখেই রিক্শাওয়ালাকে বলে গাড়ির মুখ ঘোরাতে।

তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে টাকা বার করে বাসন্তী রিক্শাওয়ালার দিকে এগিয়ে যায়। রিক্শার স্বল্পালোকে তা দেখতে পেয়ে কমল বলে—ভাড়াটা আমিই দিচ্ছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসন্তী বলে—আচ্ছা, আমি ভাড়া দেব না।

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে কমল আবার শুরু করলো ইন্স্টিটিউটের দিকে যেতে। আর গলির মোড় বেঁকে বাসন্তী অদৃশ্য হলো।

মাঝে মাঝে সংসারে এমন ঘটনা ঘটে যা সত্য হলেও অবিশ্বাস্য। মানুষের কল্পনা নয়, ভাবুকের বিলাস নয়, পাথরের মতনই কঠোর ও বাস্তব।

আগেই বলেছি নিরঞ্জন বাড়িতে কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলতো না। কিন্তু সুজিতবাবু মৌনভাবেই নিরঞ্জনের ওপর রেখেছিলেন তাঁর সজাগ দৃষ্টি। পুত্রের গৌরবে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। তাই নিরঞ্জন যেদিন প্রথম বিভাগে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করলো সেদিন তাঁর আর আনন্দের সীমা ছিল না। আমার

বাবাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—চোখ থাকতে আমরা যা পারিনি, খোকা আমার তাই করলো। তুমি দেখে নিও ননী, রায়-বংশের নাম খোকাই আমার উজ্জ্বল করে রাখবে।

নিরঞ্জনকে তখনই তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর কাছে। কিন্তু তখন সে বাড়ি ছিল না।

আজ মাসখানেকের ওপর সুজিতবাবু শয্যাশায়ী। কারুর কোনও কথা না শুনে, আমার বাবাকে তিনি হুকুম করলেন বাড়িতে একটা উৎসবের ব্যবস্থা করতে।

কাছেই নির্মলা দেবী বসে ছিলেন। প্রথমটা তিনি কোনও কথাই বলেননি। এবারে বললেন—তোমার হার্টের অসুখ করেছে, চলাফেরা দূরে থাক, ডাক্তারে তোমাকে বেশী কথা বলতেই বারণ করেছে। এরকম সময় বাড়িতে এই সব ব্যবস্থা করা কি ঠিক হবে ?

উৎসাহিত হয়ে সুজিতবাবু বলেছিলেন—নিশ্চয়ই হবে। তুমি না বুঝতে পারলেও আমি তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার বোধ হয় এবারে হিসেবের সময় এসেছে। আর যদি তা নাও এসে থাকে, তা হলে এমন দিন তো আর আসবে না।

নির্মলা দেবী প্রশ্ন করেছিলেন—খোকা এবার কি করবে ?

সুজিতবাবু বলেছিলেন—কী আর করবে সে! শেষ পরীক্ষাটা পাস করবে। তার পরে তার যা ইচ্ছে। আমার দুঃখ হয় বড়বৌ, আমার এমন ছেলের ভবিষ্যতও আমি অন্ধকার মনে করেছিলাম। তোমাদের সঙ্গে আমিও তার ভাগ্যের জন্যে কেঁদেছিলাম।

কথাটা সেইদিন সেইখানেই চাপা পড়ে যায়। সুজিতবাবুর নির্দেশমত উৎসবের আয়োজন হয়। নিরঞ্জনও তার বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করে। গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া কিছুরই ত্রুটি ছিল না। দশ হাজার টাকা দিয়ে সুজিতবাবু হ্যামিলটনের বাড়ি থেকে

কিনে আনেন হীরের বোতাম আর আংটি। সন্ধ্যেবেলায় নিজের হাতে তাকে তা পরিয়েও দিলেন।

উৎসবশেষে নিরঞ্জন কি কারণে গিয়েছিল তাদের ভেতরের বাড়িতে। হয়তো তার দিদি মাধুরী আর ভগ্নীপতি অশোকের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সুজিতবাবুর ঘরের সামনে আসতেই সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারই মা আর বাবার মধ্যে কথা শুনে।

নির্মলা দেবী বলছেন—এতগুলো টাকা আজ তুমি মিছিমিছি খরচ করলে!

দরজাটা ভেজানো ছিল নিরঞ্জন তা স্পষ্ট অনুভব করলো।

উৎসবের আনন্দে যে সুর তার মনে ধ্বনিত হয়েছিল, হঠাৎ এই কথায় তা যেন কোথায় কর্পূরের মত উবে গেল।

সুজিতবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাজে খরচ তুমি কি করে বলো নির্মলা?

নির্মলা দেবী বলেন—ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ, গান শেখাচ্ছ। প্রতিমাসেই ওর পেছনে কত টাকা খরচা কর। অথচ আমার মাধুরীকে পাঁচশ থেকে ছ'শ টাকা পাঠাতে বললে তুমি বিরক্ত হও। আজ খোকার জন্যে তুমি দশ হাজার টাকা খরচা করলে, কিন্তু আমার মাধুরীর যদি একটা গয়না গড়িয়ে দিতে বলি, তুমি তাতে রাগ কর। অথচ হীরের আংটি আর বোতামের সৌন্দর্য ও কোনও দিনই দেখতে পাবে না। এমন কি কেউ যদি ওর কাছ থেকে চুরিও করে নেয়, তাও বুঝতে পারবে না। এগুলো তোমার কিরকম যেন একচোখোমি!

নিজের রাগটাকে চাপতে চাপতে সুজিতবাবু বলেন—তুমি কি বলছ নির্মলা! ও-না তোমার পেটের ছেলে?

নির্মলা দেবী বলেন—সেই জন্যেই তো বলতে পারছি। মাধুরীও তো আমার পেটের মেয়ে! তার দুঃখই বা আমি কেমন করে দেখি বলো?

সুজিতবাবু বলেন—মাধুরীর জন্যে আমি কি কম করেছি? তোমার বাপের বাড়ির কথা শুনে অশোকের সঙ্গে তুমি মাধুরীর বিয়ে দিলে। সেদিন আমার একটা কথা কানে নিয়েছিলে? সুন্দর দেখতে ছেলে, বি. এ. পাস দেখে তুমি আর তোমার ভায়েরা ভুলে গেলে। বিয়ের পর জানা গেল অশোকের বাপের বিশেষ কিছুই নেই। তবুও আমি হাল ছাড়িনি, ওকে পাঠালাম বিলেতে মানুষ হয়ে আসবার জন্যে। আই. সি. এস.-এ দুবার ফেল করলো। অনেক কষ্টে ব্যারিস্টারি পাস করলো। দেশে ফেরবার নামও করে না—কেনই বা করবে, শ্বশুরের টাকা পাচ্ছিল মাসে মাসে। তারপর জোর করে কোলকাতায় নিয়ে এলাম। বাড়ি কিনে দিলাম। মাধুরী আলাদা সংসার পাতলো। কিন্তু, কাজ করবার ইচ্ছে কি তোমার জামাইয়ের হলো? আজ সুট, কাল গাড়ি, পরশু পার্টি—প্রথম প্রথম কত বায়নাক্কা। খবর নিয়ে পরে জানতে পারলাম, এক মাসের মধ্যে হাইকোর্টের মুখোও সে হলো না। তাই তো এই ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এতেও, এতো পেয়েও তোমার মেয়েজামাই খুশী হয়েছি কি?

একরকম উত্তেজিত স্বরেই নির্মলা দেবী বলেন—তুমি কার জন্যে খরচা করোনি? মাসে মাসে তুমি যে ছেলের পেছনে এত টাকা খরচা করছ, সেই বা ভবিষ্যতে কি করতে পারবে? তুমিই বা সারাজীবনটা কি করলে?

নিরঞ্জনের পা কাঁপতে থাকে। সারা মনটা ঘৃণায় যেন মুচড়ে ওঠে। তার মনে হয়, সত্যিই সে ভবিষ্যতে কি করবে? সামনের বারান্দার রেলিংগুলো ধরে সে এগিয়ে যেতে থাকে তার নিজের ঘরের দিকে। সারা জগৎকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—ওগো, আমার কিছু চাই না। যা কিছু আছে তোমরা সব নাও—বিনিময়ে আমাকে একটু ভালবাসো।

একরকম মাতালের মতন টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানায় সে শুয়ে পড়ে!

উত্তেজনায় ঘরের দরজাটাও সে বন্ধ করতে ভুলে যায়। দামী বোতামটা জামা থেকে, আর আংটিটা খুলে নিয়ে সে গুঁজে রাখে বালিশের তলায়। তার মনে হয়, এই দুটো জিনিসের জন্যেই আজ সে হারিয়েছে তার মায়ের স্নেহ। কাল সকালে উঠেই সে ওই দুটো জিনিস তার ভগ্নীপতিকে দিয়ে দেবে।

অশোকের জীবনের ব্যর্থতার কথা, দিদির আথিক কষ্টের কথা, সুজিতবাবুর সাহায্যের কথা—সব কিছুই তার কাছে ছিল অজ্ঞাত। তার যত অভিমান গিয়ে পড়ে তার ঠাকুমার ওপর। কেন ছেলেবয়সে তাকে অত যত্ন করে মানুষ করেছিলেন? সে বাগানে গেলে নিজের পুজো ফেলে তিনি ছুটে যেতেন—কি দরকার ছিল তাঁর? ছেলেবয়সেই যদি সে পুকুরে ডুবে মরতো তা হলে তো সব অশান্তির শেষ হয়ে যেত! মাধুরী সম্পত্তি পেত—নির্মলা দেবীর অভিযোগেরও কিছু থাকতো না। কেন তাকে সুজিতবাবু গান আর লেখাপড়া শেখালেন? নিজের শিক্ষায় কেন সে বুঝলো যে সে-ও মানুষ! অপরের মত তারও বাঁচবার অধিকার আছে! কেন বাসন্তী তাকে প্রলোভন দেখালো? জীবন যে অত সুন্দর তা তো সে বোঝেনি! কিন্তু তার মনের মধ্যে এই জ্বালার সৃষ্টি করে কেনই বা বাসন্তী আর একজনের প্রেমাসক্ত হয়ে চলে গেল? সে তো বাসন্তীকে কোনদিন ভালবাসার অভিনয় করতে বলেনি! আজকের এই হীরের আংটি, বোতাম সে তো তার বাবার কাছে চায়নি! তার হাতের সোনার ঘড়িটা—যা এখনও টিক-টিক করছে, এর কথা কোনদিন তো সে বাবাকে বলেনি! তারই বি. এ. পরীক্ষার সুবিধা হবে বলে তারই তো বাবা সেটা জোর করে তাকে আনিয়ে দিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে! ভাগ্যের একি নির্মম পরিহাস!

অনেকক্ষণ ধরে এই সব এলোমেলো চিন্তা করে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে নিরঞ্জন যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা সে নিজেই জানতে পারেনি। তার ঘুম ভাঙে তারই জন্য নিযুক্ত ভোলার ডাকে। ভোলা বলে—দাদাবাবু, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও, বাবু তোমায় ডাকছেন।

"যাচ্ছি" বলে নিরঞ্জন বিছানা ছেড়ে ওঠে।

তার মনের মধ্যে তখনও সে শুনতে পাচ্ছে নির্মলা দেবীর সেই কণ্ঠস্বর।

মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে নিয়ে নিরঞ্জন প্রস্তুত হয় সুজিতবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। ভোলার আনা জলখাবারে সে হাতও দেয় না। চায়ের কাপটা টেনে নেয় সে কেবল।

সে যখন সুজিতবাবুর ঘরের উদ্দেশে যাচ্ছিল, এমনি সময় ভোলা তাকে ডেকে বলে—দাদাবাবু, আংটি আর বোতামটা বিছানার ওপর ফেলে যাচ্ছ যে?

ও দুটোর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়তে তাড়াতাড়ি সে দুটোকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের আলমারির ভেতর পুরে রাখে সে। তারপরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় সুজিতবাবুর কাছে।

বাইরের ঘরে ঢুকতেই সুজিতবাবু তাকে বলেন—এই চেয়ারটা টেনে বসো।

হাতের ওপর নজর পড়তেই তিনি জিজ্ঞেস করেন—আংটিটা খুলে ফেলেছো যে?

কি জবাব দেবে নিরঞ্জন? আমতা আমতা করে বলে—আজ্ঞে অত দামী আংটি, সব সময় হাতে পরে থাকবো? পড়ে গেলে জানতে পারবো না।

সুজিতবাবু স্তম্ভিত হয়ে কি যেন খানিকক্ষণ ভেবে নেন।

তারপর বলেন—তোমার চেহারা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল আছে তো?

সংক্ষেপে নিরঞ্জন জবাব দেয়—আজ্ঞে ভালই।

সুজিতবাবু বলেন—দেখো, তোমাকে একটা কথার জন্যে ডেকেছি। আমাদের রায়বংশে তুমিই প্রথম বি. এ. পাস করেছো। সেজন্যে আমার আনন্দের সীমা নেই। তা ছাড়া গানেতেও তুমি যা নাম করেছো, এতটা তোমার আগে আর কেউ করতে পেরেছিল কিনা তা আমার জানা নেই। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, তুমি দিন দিন উন্নতি করো। কি পড়বে তুমি ঠিক করলে?

একরকম মাথা নীচু করেই নিরঞ্জন বলে—আজ্ঞে পড়ার মধ্যে তো ওই একটাই আছে, এম. এ. পাস করা।

—কি সাব্‌জেক্‌টে পড়বে?

নিরঞ্জন মাথা নীচু করে জবাব দেয়—আজ্ঞে, তা তো ঠিক করিনি।

—ঠিক করোনি! এদিকে যে কলেজ খুলবার সময় হয়ে এলো।

নিরঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নেয়। তারপর বলে—আমি ভাবছি আর পড়বো না।

—পড়বে না!

সুজিতবাবু বিস্মিত হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করেন।

নিরঞ্জন বলে—আজ্ঞে পড়েও যা করবো, না পড়েও তো তাই করতে হবে! তাই—

সুজিতবাবু কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলেন—কি করতে চাও তুমি?

একটু ঢোক গিলে নিয়ে নিরঞ্জন বলে—আজ্ঞে, আমি তো বিশেষ কিছু করতে পারবো না···তাই ভাবছিলাম আর পড়াশুনো করে কি হবে?

সুজিতবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন—তাই বলে কি বসে থাকবে বলে ঠিক করেছ ?

একরকম অপরাধীর মতই নিরঞ্জন জবাব দেয়—আজ্ঞে না, তা ঠিক নয়। ভেবেছিলাম, গান তো যথেষ্ট শিখলাম! এই গান দিয়েই যদি কিছু রোজগার করা যায়!

—গান দিয়ে রোজগার করবে ? কেন ? তোমার কি অভাব দেখা দিয়েছে ? রায়বংশের জমিদারি কি নিলামে উঠেছে ? যার জন্যে তোমাকে এখনই রোজগারের কথা ভাবতে হবে। জমিদারির কথা ছেড়ে দিলেও পাঁচ-পাঁচটা কোলিয়ারির মালিক হবে ভবিষ্যতে তুমিই। আপাতত তোমার অর্থচিন্তা না করলেও চলবে। ওসব পাগলামো খেয়াল ছেড়ে দাও। মনে রেখ, তুমি সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ হরিহর রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, যিনি সংগীতকে বেছে নিয়েছিলেন ঈশ্বর সাধনের একটা পথ হিসাবে। আর সেই বংশে জন্মে তুমি সংগীতকে পণ্যদ্রব্যের মত বিক্রি করবে ? এ কল্পনা তুই কেমন করে করলি খোকা ?—সস্নেহে সুজিতবাবু পুত্রের হাত চেপে ধরেন।

সুজিতবাবুর স্নেহস্পর্শে নিরঞ্জনের অবাধ্য অশ্রু আর বাধা মানে না —ঝরঝর করে তা ঝরে পড়ে তাঁরই সামনে। সস্নেহে সুজিতবাবু এগিয়ে যান নিরঞ্জনের কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বলেন—লেখাপড়া শিখে তুমি এতটা দুর্বল হয়েছ, এ তো আমি আশা করতে পারিনি! কি হয়েছে ? আমাকে বলবে ?

নিরঞ্জন বলে—এমন বিশেষ কিছুই নয়।

সুজিতবাবু বলেন—থাক। তোমার যখন আপত্তি আছে তখন আমি আর তা শুনতে চাই না।

খানিকটা থেমে সুজিতবাবু আবার বলেন—পাগলামি রেখে আজই এম· এ. ক্লাসে তুমি ভরতি হও। মনে রেখ, তোমার মুখের দিকে

খানি আমিই চেয়ে নেই। আমার মত শত শত হতভাগ্য পিতা তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তোমার সফলতার ওপর তাদের ভবিষ্যতের কার্যক্রম নির্ভর করছে। হয়তো একদিন তাদেরও মন আমারই মত ছেলের গৌরবে ভরে উঠবে!

নিরঞ্জনের মনের কালো মেঘটা সুজিতবাবুর স্নেহস্পর্শে অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে বলে—ইতিহাসে যখন অনার্স পেয়েছি, তখন ওই বিষয়েই আমার এম. এ. পড়া ভাল।

সুজিতবাবু বলেন—সেটা তুমি যে রকম ভাল বুঝবে তাই কর। আর একটা কথা বলি তোমাকে, বলা আজ দরকারও মনে করছি—কারণ আমি কবে আছি কবে নেই, বিপদ দেখে কোনও দিন পেছিয়ে যেও না। নিজের লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেও। কারুর কথা শুনে নিজের মনে সন্দেহ এনো না। জেনো ফল তাতে কখনই ভাল হয় না। আর একটা কথা—তুমি ছেলেমানুষ, জানো না, তাই তোমাকে বলে দেওয়া দরকার। কারণ তোমার কথা শুনে আজ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি কারুর কোনও কথাতে তুমি মনে খুব আঘাত পেয়েছ। সংসারে বাঁচতে গেলে এমনি আঘাত বহু আসবে তোমার জীবনে। কারণ মানুষের স্বভাবই অপরকে আঘাত করে আনন্দ পাওয়া। সে আঘাত যদি সে না করতো তা হলে এই পৃথিবীর মতন সুন্দর স্থান বোধ হয় হতো না। স্বয়ং রামচন্দ্র আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। এ ছাড়া মহাভারতের কথা তো তুমি জানই। তুমি শিক্ষিত ছেলে, তোমাকে আর কী বলব? তবে যদি ভেবে থাক, এই পৃথিবী তোমার মনের মতন হয়ে চলবে, তা হলে আরও আঘাত পাবে। জেনে রেখো, এই পৃথিবীর মানুষের গতি কেউ রুখতে পারে না। সে তার নিজের গতিবেগে এগিয়ে যাবেই যাবে। তুমি যদি সেই স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে না যাও, তবে প্রচণ্ড বেগে তোমাকে আছাড় মেরে দুমড়ে ভেঙে তার গতিপথ থেকে

সরিয়ে দেবে। এই তো, তুমি ইতিহাসের ছাত্র, অবশ্যই জানো, ইংরেজ ভারত জয় করেছিল। পাছে দেশবাসী বিদ্রোহ করে তাই অস্ত্র অবধি কেড়ে নিয়েছিল। পারলো কি তারা সিপাহী বিদ্রোহ ঠেকাতে? তার ওপর দেখ, আজ কয়েকজন, মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বক্তৃতার জোরে ভারতের ইংরেজ শাসন কেঁপে উঠেছে। জানি না ভবিষ্যতে কি হবে। তবুও যা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, তার থেকেই বলছি, ইংরেজদের বোধ হয় ভারত থেকে যেতে হবে। নইলে কি তারা ওই ছোট-কাপড়-পরা মহাত্মা গান্ধীকে বিলেতে নেমন্তন্ন করতো? যাই হোক, মনের চঞ্চলতা ঝেড়ে ফেল, এগিয়ে চলো। দাঁড়াবার সময় কোথায় বাবা? আচ্ছা, তুমি আজ ননীকে সঙ্গে নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভরতি হতে যেও। আর যদি পার, আইনটা পড়ে ফেলো। কারণ ভবিষ্যতে জমিদারি চালানোর কাজে অনেকখানি সাহায্য পাবে।

নিরঞ্জন সুজিতবাবুর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে উঠে যখন নিরঞ্জন তার পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ সুজিতবাবু মারা গেলেন। আর এই সুজিতবাবুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রায়পরিবারের মধ্যে ঘটলো এমন একটি ঘটনা যাতে নিরঞ্জন হারালো তার শুভাকাঙ্ক্ষীকে। এই পৃথিবীটা এর পর থেকে তার কাছে হয়ে উঠলো রৌদ্র-তাপদগ্ধ—একেবারে শুকনো, খটখটে। পানীয় নেই, অথচ তৃষ্ণায় বুঝি বুক ফেটে যায়। সে কি নিদারুণ জ্বালা! অথচ বাঁচতে হবে, সামাজিকতা রাখতে হবে, নইলে লোকে কি বলবে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে হাসি ফুটিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে করতে হবে আপ্যায়ন! নিরঞ্জনের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছে এর

বিরুদ্ধে। তখনই তার মনে পড়ে গেছে সেই মৃত পিতার ধীর কণ্ঠস্বর! স্রোতের সঙ্গে ভেসে তোমায় যেতেই হবে; নইলে…। তাইতো সে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। অনেকদিন সে ভেবেছে এর শেষ কোথায়! শেষ যে কোথায় তা কে বলবে! ভবিষ্যৎ, মানুষের কাছে চির অন্ধকার বলেই তা জানবার তার এত আগ্রহ। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'চারটে মনভোলানো কথা শোনবার জন্যে কত শিক্ষিত সভ্য লোককে দেখেছি ফুটপাথের ওপর বসে জ্যোতিষীকে হাত দেখাচ্ছে। মিলবে না জেনেও খবরের কাগজের "এ সপ্তাহ কেমন যাবে" বিভাগ খুলে পড়ছে। কতবার ভেবেছি সুজিতবাবুর কথামতই বুঝি মানুষগুলো ভেসে চলেছে, তাদের বুঝি কিছু করবার শক্তি নেই। প্রকৃতির নিয়মে তারা বদ্ধ। তাই এক ঘণ্টা পরের ভবিষ্যৎ জেনে মানুষ করেছে তৃপ্তিলাভ।

নিরঞ্জন এই অশান্তির হাত থেকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু কি করবে সে, সেও যে সে-নিয়মে বদ্ধ। তাই বুঝি তার সে চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল।

সুজিতবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই আমার বাবা সব কথা নিরঞ্জনকে জানাতেন এবং তার হুকুম মতন সব কাজ করতেন।

নির্বিঘ্নে অশৌচ ও শ্রাদ্ধ মিটে গেল, কিন্তু গোল বাধলো তার পরে।

এতদিন যা কিছু করতে হবে, নিরঞ্জন তার মা নির্মলা দেবীর মতামত নিয়েই করতো। তাই মাতা-পুত্রের মধ্যে ইদানীং একটা সহযোগিতার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনরা যে যেখানে ফিরে যাবার চলে গেছেন। বাড়িতে আছে কেবল নিরঞ্জনের দিদি মাধুরী।

সে রাত্রে নিজের পড়াশুনো সেরে নিরঞ্জন যাচ্ছিলো নিজের ঘরে

শোবার জন্যে। এত রাত্রে নির্মলা দেবী জেগে আছেন জানতে পেরে সে একটু বিস্মিতই হলো। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটু ঝাঁঝালো স্বরে নির্মলা দেবী প্রশ্ন করেন—আজকের ব্যাপার শুনেছ?

—ব্যাপার?—নিরঞ্জন চমকে উঠলো। ধীরে অথচ গম্ভীর কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে?

মাধুরী কান্নার সুরে বলে—অপমানটা তুমি নিজে না করে, লোকজনকে দিয়ে করালে কেন? তুমি বললেই তো আমি চলে যেতুম।

নিরঞ্জন তো স্তম্ভিত। নির্মলা দেবীকে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে মা?

নির্মলা দেবী বলেন—কিছুই কি তুমি জানো না?

—তুমি বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানি না।

—ননী আজ অশোককে অপমান করেছে।

বিস্মিত নিরঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—কারণ?

—বোধ হয় তোমার শেখানো আছে! কিংবা সে মনে করেছে এইবার তোমাকে নিয়ে, তোমার ম্যানেজার হয়ে সর্বস্ব লুটেপুটে নেবে।

নিরঞ্জনের মুখ থেকে বের হয়ে আসে—কাকাবাবু তো তেমন লোক নন। তা ছাড়া তিনি অনেকদিন ধরেই বোধ হয় কাজ করছেন। বাবা ওঁকে বিশ্বাসও করতেন। এরকম অবস্থায় কেন অপমান করলেন, কি হলো কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তুমি বিশ্বাস করো মা, আজ রাত্রে কাকাবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কারণ আমি যখন ফিরেছি তখন তিনি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। কাল যা হয় এর একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু খামকা তিনি জামাই-বাবুকে অপমান করবেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেয় মাধুরী। এবারে আর কান্নাভেজা কণ্ঠে

নয়, তেজোদ্দীপ্ত স্বরে সে বলে—বাবার শ্রাদ্ধতে কত খরচা হয়েছে, কেউ কিছু চুরি করছে কিনা, তোমার ভালর জন্যেই উনি গিয়েছিলেন হিসেবের খাতা দেখতে। কাকাবাবুর কাছে খাতা চাইতেই তিনি বললেন—তোমার হুকুম ছাড়া এখন কিছুই কাউকে দেখাতে পারেন না। কারণ, এইটেই নাকি বাবার নির্দেশ। অথচ যে চাইছে সে যে বাবার জামাই এটা তিনি ভুলে গেলেন।—কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে মাধুরীর গলা আবার কান্নায় ভরে ওঠে।

তাকে সান্ত্বনা দেবার স্বরে নির্মলা দেবী বললেন—ও বড় সাংঘাতিক লোক। আজীবন কর্তাকে জ্বালিয়েছে। এইবার যে কি করবে তা ভগবানই জানেন। তুই অশোককে রাগ করতে বারণ কর, কেন সে আমায় কোনও কথা না বলে চলে গেল।

কান্নাভাঙা কণ্ঠে মাধুরী বলে—যাবে না, এর পরেও তাকে থাকতে বল মা?

নির্মলা দেবী বললেন—শোন্ খোকা শোন্! তোর জামাইবাবুর কি রকম মনে লেগেছে বোঝ। আর তোর হিতৈষীদেরও চিনে রাখ। আর কাল সকালবেলায় ননী এলেই, আগে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর।

নিরঞ্জন কথা বলতে পারে না, মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার মনে পড়ে যায় মৃত পিতার একটি কথা—সংসারে ননীর মত বন্ধু তুমি খুব কম পাবে। কারণ সে ভগবানকে চিন্তা করতে শিখেছে। বিপদে আপদে সব সময় তার সঙ্গে পরামর্শ করে চলো। জেন সেও তোমায় ছেলের মতনই ভালবাসে, তোমার চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

এখন সে উভয়সংকটের মধ্যে পড়ে কি করে? রাত্রে দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় পড়ে তার ঘুম আসতে চায় না। বিছানায় শুয়ে কেবলই ছটফট করে। ইলেক্‌ট্রিক পাখাটা কখনও বা জোর করে

কখনও বা কমিয়ে দেয়। তার মনে হতে থাকে কেবল একটি কথা—কাকাবাবু এমন কাজ কেন করলেন? আজ কে তাকে প্রকৃত পরামর্শ দেবে? কোনদিন তো সে নিজে কর্তব্য স্থির করতে পারতো না! নিজের গান-বাজনা আর লেখাপড়া নিয়েই তো সে ছিল! কারুকে বিরক্ত করতে তো সে চায়নি! হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, এই সময় তার পাশে যদি বাসন্তী থাকতো! তা হলে হয়তো সেই তাকে তার কর্তব্য কি বলে দিত। কিন্তু কোথায় বাসন্তী? সুখের কল্পনা করে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে হয় ক্লান্ত। বাস্তবতায় তার প্রতিচ্ছবি না দেখতে পেলে অতীত দিনের স্মৃতির থেকে মন ঘটনা সংগ্রহ করে বর্তমানের সঙ্গে একটা যোগাযোগের চেষ্টা করে। অনেক সময় স্মৃতিকেই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা হয় না। তাই বোধ হয় নিরঞ্জন কল্পনা করে, বাসন্তী বোধ হয় সত্যিই তাকে কোনও দিন ভালবাসে না। কেনই বা বাসবে? সে যে দৃষ্টিহীন। অন্য ছেলেদের মতন বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে সে তো কোনও দিনই বলতে পারবে না—বাসন্তী, তুমি কি সুন্দর!

এতবড় আঘাতের জন্যে হয়তো মন প্রস্তুত ছিল না। তাই মনের আর একটা দিক্ বলে ওঠে, এটা সত্যি নয়, অত মিষ্টি ব্যবহার যার সে কি ঠকাতে পারে? ভালবাসা আর স্নেহ বিলোনোই যে তার ধর্ম। মনের অপর দিক্ বলে, কেন হতে পারে না? তোমরা যেটা ভালবাসা বলে ধরছ সেটা হয়তো ভালবাসাই নয়। সেটা ছিল তার অনুকম্পা। যার নাম দয়া বা করুণা! ভালই যদি সে বাসবে তা হলে নিরঞ্জন যেদিন তার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিল—আমাদের এই ভালবাসা, সবই কি মিথ্যে হবে ভবিষ্যতে? তুমি কি আমায় ভুলে যাবে?

সেদিনও তো গম্ভীর হয়ে বাসন্তী জবাব দিয়েছিল—সে প্রশ্নের

জবাব দেবার সময় তো এখনও হয়নি! আর ব্যর্থ হবে কি না?—সে তো জানে ভবিষ্যৎ।

তবুও নিরঞ্জন প্রশ্ন করেছিল—তুমি আমায় ভালবাস বাসন্তী?

উত্তরে—"ভালবাসি"—এ কথা সে তো বলেনি। কেবল বলেছিল—ভালবাসা মানে ত্যাগ। আমি যদি ভবিষ্যতে তোমার জন্যে ত্যাগ করতে পারি তা হলেই তুমি বুঝে নিও আমি তোমায় ভালবাসি। মুখে বলে তো লাভ নেই। আমার ব্যবহারই তোমায় বুঝিয়ে দেবে আমি ভালবাসি কি না।

এই সব দ্ব্যর্থমূলক কথায় সেই তো বোকার মতন ধরে নিয়েছিল—বাসন্তী তাকে ভালবাসে। তার জন্যে আর যেই দায়ী হোক, বাসন্তী কখনও দায়ী হতে পারে না। কিন্তু এখন উপায় কি হবে? সরকার কাকা কি সত্যিই তাকে ভালবাসেন না? বাসন্তী যখন নেই, কর্তব্য স্থির তাকেই করতে হবে। বাবাও কি ভুল করে গেলেন? এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিছানায় পড়ে সে ছটফট করতে থাকে।

ঢং করে বড় দেওয়াল ঘড়িটায় রাত সাড়ে চারটে বেজে গেল। আর বিছানায় সে চুপ করে শুয়ে থাকতে পারে না।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে ঢুকে ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। তার কেশহীন উত্তপ্ত মস্তকে বার বার জল ছিটিয়ে সে ঠাণ্ডা হতে চায়। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় নিজের গানের ঘরে।

বাক্স থেকে বেহালাটাকে বার করে নিয়ে সে শুরু করে দেয় ললিত রাগের আলাপ। তার অশান্ত প্রকৃতি কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে আসে।

যথানিয়মে আমার বাবা কাজে আসেন, নিরঞ্জন তাঁকে ডেকেও পাঠায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিরঞ্জন তাঁকে প্রশ্ন করে—কাল

জামাইবাবু খাতা দেখতে চেয়েছিলেন, আপনি দেখাননি কেন কাকা?

বাবা খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে নেন। তারপরে বলেন—এ ব্যাপারে যে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে তা আমার জানা আছে। সন্ধ্যেবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলুম এই রকমই একটা কিছু ঘটবে। শোন নিরু—আশা করি সুজিতবাবুর মতন তুমিও আমাকে বিশ্বাস করবে। আর অবিশ্বাসের কাজও আমি এখনও পর্যন্ত কিছু করিনি। তোমার স্বর্গীয় পিতা একটা উইল করে গেছেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন ওই অশোক থেকে তোমাদের পরিবারে একটা গোলমাল বাধবে। তাই তাঁর স্থাবর, অস্থাবর, যথাসর্বস্ব তিনি তোমাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। এমন কি তোমার মাকে তিনি একটি পয়সাও দিয়ে যাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন তুমি শিক্ষিত ছেলে, তোমার মাকে তুমি চিরদিনই দেখবে। রায়বংশের মর্যাদা তুমি রক্ষা করেই চলবে।

নিরঞ্জন স্তম্ভিত। যে বাবার সঙ্গে জীবিত অবস্থায় ভালভাবে কথাও সে বলতো না, সেই বাবাই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন! তাঁরই স্নেহের দান আংটি আর বোতাম সে খুলে রেখেছে!

খানিকটা নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বলে—এ দানপত্রের কথা কে জানে?

—বিশেষ কেউ নয়। জানি কেবল আমি আর যে অ্যাটর্নী এই দানপত্র লিখেছিল—সে।

—কতদিন আগে এটা লেখা হয়েছিল?

—তা প্রায় আজ দু বচ্ছর আগে।

—দিদিকে বাবা কিছুই দিয়ে যাননি?

—কিছুই নয়। কেবল যে বাড়িটায় সে আছে ওই বাড়িটা ছাড়া।

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতন নিরঞ্জন বলে—এই টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি আমার কি হবে কাকাবাবু! এততে তো আমার প্রয়োজন

নেই! তার চেয়ে বরং দিদিকে সব দিয়ে দিলে হয় না? তার প্রয়োজন আছে অনেক। ওর ছেলেমেয়ের সংসার—

একরকম মুখ থেকেই কথাটা কেড়ে নিয়ে বাবা বলেন—সেটা তোমার পক্ষে মহত্ত্ব দেখানোর খুব বড় একটা সুযোগ। কিন্তু বোধ হয় আমার মনিবের তা ইচ্ছে ছিল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল আর পাঁচজনের মতন তুমিও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হও। রায়বংশকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাও। সেই রকমই নির্দেশ তিনি আমায় দিয়ে গেছেন।

নিরঞ্জন ভাবে—তার বাবা চেয়েছিলেন সে সংসারী হোক! তিনি বিশ্বাস করতেন তার মতন অঙ্গহীন ছেলের দ্বারা রায়বংশের উন্নতি সম্ভব!

নিরঞ্জনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বাবা বলেন—কালকে অশোককে আমি খাতা দেখতে দিইনি তার কারণ, খাতা দেখবার অছিলায় সে তোমার আয়-ব্যয় দেখতে চেয়েছিল। তার মতন আইন-জানা লোককে আমি বিশ্বাস করিনি। আর সে তোমার কোনও ক্ষতি করবে না—এমন প্রমাণও কিছু পাইনি। তার ওপর আমার নতুন মনিবের কোনও হুকুমও ছিল না তাকে খাতা দেখাবার।

নতুন মনিব! নিরঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বলে—ও কথাটা কেন বলছেন! আমি আপনার ছেলের বয়সী, যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমাকে যেমন নির্দেশ দেবেন তাই হবে। মনিব আপনার এক জনই ছিলেন।

নিরঞ্জনের এই বিনয়পূর্ণ কথা শুনে বাবা মুগ্ধ হয়ে যান। চেয়ার থেকে উঠে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন—ছেলে যদি ম্যাজিস্ট্রেট হয়, আর বাপ যদি উকিল হয়, কোর্টে দাঁড়িয়ে ছেলেকে হুজুর বলে সম্বোধন করতে বাপের বুক আনন্দে দশ হাত হয়ে ওঠে। তাই বোধহয় লোকে ছোট শিশুকে বাবা বলে ডাকে! তাই আমি

তোমাকে 'নতুন মনিব' বলেছি—এটা আমার গর্বের কথা। —কথাটা বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে নিরঞ্জনের মাথায়।

*

* *

নিরঞ্জনের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আমি যেমন সাহায্য পেয়েছিলাম ডাঃ ঘোষ আর বাবার ডায়েরী থেকে, তেমনি পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছে নিরঞ্জনের বন্ধু কমলদা আর বাসন্তী দেবী। তাদের সাহায্য না পেলে হয়তো এ কাহিনীর আর একটা দিক্ মানুষের কাছে চির অজ্ঞেয়ই থেকে যেত।

একদিন বেলা ন'টার সময় টালিগঞ্জের ট্রামের জন্যে কমলদা অপেক্ষা করছিল। হাতে তার সেইদিনকার সংবাদপত্র। তাতে বের হয়েছে নিরঞ্জন রায়ের প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাসের খবর। খবরের কাগজওয়ালারা তার একখানা ছবিও ছেপেছিল সেদিন।

আজ বছরখানেকের ওপর কমলদা কাজ নিয়েছে নিরঞ্জনের কাছে। তার কোলিয়ারি দেখাশুনার ভার।

কি কারণে জানি না কমলদা এসেছিল কোলকাতায়, বোধ হয় কোলিয়ারি সংক্রান্ত কোনও হিসেব তাকে বুঝিয়ে দিতে।

সকালবেলাকার বেশ খানিকটা সময় সেখানে কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছিল সে নিজের বাড়িতে। অবশ্য আজকের বালিগঞ্জ আর সেদিনের বালিগঞ্জের মধ্যে আছে অনেক তফাত।

বিদ্যুতের আলো, সারি সারি দোকান, বড় বড় বাড়ি তখন কিছুই গজিয়ে ওঠেনি সেখানে। কোলকাতার লেক, যা আজকের

প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে সান্ধ্যভ্রমণের জায়গা, তার তখন সবে পত্তন হয়েছে।

মধ্য ও উত্তর কোলকাতার বহু বড়লোকের বাগানবাড়ি বা বস্তি ছিল সে জায়গায়। সন্ধ্যেবেলায় লেকের ধারে শোনা যেত শেয়ালের ডাক। কোলকাতার বহু গরিব বাসিন্দা সস্তায় বাড়ি ভাড়া নিতেন এই অঞ্চলে—এ সেই বালিগঞ্জ।

কমলদা ট্রামে উঠতেই তার চোখ পড়লো লেডীস সীটে উপবিষ্টা বাসন্তীর ওপর। তারও হাতে ছিল সেদিনকার তিন চারখানা দৈনিক পত্র।

এখনকার মত তখন ট্রামে ভিড় হতো না। বিশেষ করে লেডীস সীটের যাত্রী অতি অল্পই থাকতো। হাত নেড়ে বাসন্তী তার পাশের খালি জায়গাটায় কমলদাকে বসতে বলে।

কমলদা পাশে বসতেই বাসন্তী প্রশ্ন করে—আপনি বোধ হয় আপনার বন্ধুর ওখান থেকে আসছেন ?

কমলদার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না সেদিন। তাই ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বলে সে অন্য দিকে মন দেবার চেষ্টা করে।

দু'জনেই চুপচাপ। ট্রাম চলেছে নিজের মনে ঘড়ঘড় শব্দ করে। প্রায় দশ মিনিট কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

এরই মাঝখানে কেবল শোনা যাচ্ছে যাত্রীদের ওঠা-নামার শব্দ ও কণ্ডাকটারের টিংটিং ঘণ্টার ধ্বনি।

বাসন্তী বার বার কমলদার মুখের দিকে চায়। তার ভাবগতিক দেখে তখন মনে হচ্ছিলো কমলদার ব্যবহার তার কাছে অপ্রত্যাশিত। সে যেন এ জিনিস কল্পনাই করেনি। কিন্তু তবু, কোথায় যেন তার একটা হিসেবে ভুল হয়ে যাচ্ছে। বার বার চেষ্টা করেও সে তা সংশোধন করে নিতে পারছে না।

নীরবতা ভঙ্গ করে বাসন্তীই প্রথম কথা বলে—এত গম্ভীর কেন কমলবাবু ? কোনও বিপদ আপদ ঘটেছে কি ?

কমলদা গম্ভীর হয়েই জবাব দেয়—বিপদ? না, তেমন তো কিছুই হয়নি।

—হয়নি তো আপনি এত গম্ভীর কেন?

—মনটা আমার ভাল নেই।

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বাসন্তী প্রশ্ন করে—আপনি বললেন আপনি আসছেন নিরুর বাড়ি থেকে, সে আজ ইউনিভার্সিটিতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো—তবুও আপনার মন-খারাপের কারণ? তাদের বাড়িতে আজ আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে!—কথাটা শেষ করে বাসন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে কমলদা বলে—তা যদি হতো তা হলে আপনার মতন আমিও সুখী হতাম। কিন্তু তার বদলে সেখানে আজ বইছে দুঃখের স্রোত।

উদ্বিগ্ন হয়ে বাসন্তী প্রশ্ন করে—তার মানে?

কমল বলে—সে সব কথা ট্রামে বসে বলা যায় না। আর এক কথায়ও সে কথা শেষ করা যায় না।

বাসন্তী স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভেবে নেয়। তারপর বলে—সামনের স্টপেজের কাছেই আমার বাড়ি। দয়া করে যদি আমার বাড়িতে যান, তা হলে সেখানেই সব কথা হতে পারে।

কমলদা তো স্তম্ভিত। তিন বছর আগে অত ঝড়জল সত্ত্বেও যে বাসন্তী কমলদাকে বাড়ি দেখাতে রাজী হয়নি, সেই বাসন্তী আজ নিজে যেচে তাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার বাড়ি যাবার জন্যে? ব্যাপার কি? এ কি নিছক কৌতূহল, না আর কিছু?

কমলদাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—কাজ আছে কি? যেতে পারবেন কি আপনি? নিরঞ্জন ভাল আছে?

মুখে একটু হাসি টেনে কমলদা বলে—শারীরিক ভালই, তবে—

ট্রাম ততক্ষণে এসে পড়েছিল তার নির্দিষ্ট স্টপেজে। তাড়াতাড়ি নিজের হাতব্যাগ আর ছাতাটা নিয়ে বাসন্তী বলে—আসুন কমলবাবু, আমরা এসে পড়েছি। সামনের গলিটার মধ্যেই আমার বাড়ি।—কথা শেষ করে বাসন্তী নামতে উদ্যত হয় ট্রাম থেকে।

ট্রাম থেকে নেমে বাসন্তী ধরে সোজা বাঁ দিকের গলিটা। ইটবাঁধানো গলি, তায় সরু। দুপাশের বাড়িগুলোর চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে বাড়িগুলোর মালিক অভিজাতশ্রেণীর। এখানে ওখানে চুন-সুরকি উঠে গেছে, সেখানে পড়েছে বর্ষার সঙ্গে শেওলার প্রলেপ। কমলের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। সে একমনে বাসন্তীকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলো। এমনি একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে বাসন্তী দাঁড়িয়ে পড়ে দরজায় আঘাত করে। দরজা খুলে দেয় একজন স্ত্রীলোক। চেহারা দেখে কমলের তাকে পরিচারিকা বলেই মনে হয়। ভেতরে ঢুকেই কমল বুঝতে পারে যে, প্রবেশপথ অন্য কোথাও থাকলেও, কোনও বসবার ঘরের জানালা সরিয়ে দরজায় তা রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং বাসন্তী বাড়িতে সেই পথেই যাতায়াত করে। বোধ হয় বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক রাখবার জন্যই তার এই প্রচেষ্টা।

ঘরের মধ্যে একটা আসন বিছিয়ে দেয় বাসন্তী কমলকে বসবার জন্যে। তারপর রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বার হয়ে যায় অপর একটা দরজা দিয়ে। প্রায় মিনিট দশ বারো পরে সে যখন ফিরে আসে সেখানে, দেখা যায় যে, তার হাতে রয়েছে জলখাবারের ডিস আর পেছনে পরিচারিকার হাতে রয়েছে চায়ের কাপ। ডিসটা কমলের সামনে নামিয়ে রেখে সে পরিচারিকার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিজের হাতে নেয়। তারপর কমলকে উদ্দেশ করে বলে—গরিব আমি। আপনাকে

খাওয়াতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নেই। তবু যদি দয়া করে—

কমল বলে—থাক থাক! আমিও এমন কিছু বড়লোক নই। সকাল থেকে আজ খাওয়াই ভাল করে হয়নি! সকাল থেকেই তো ঘুরছি! এই এখন আমার কাছে অমৃত!

বাসন্তী বলে—খাওয়া হয়নি? আপনি যে বললেন নিরুর ওখান থেকে আসছেন! সে বড়লোক, তার ওপর আজ তার এম. এ. পাসের খবর বেরিয়েছে। এমন একটা দিনে সে আপনাকে না খাইয়ে ছাড়লে? কী ব্যাপার বলুন তো?

কমল বলে—ব্যাপার অনেক। তবে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে মামলা।

বিস্মিত হয়ে বাসন্তী বলে—মামলা! কার সঙ্গে? নিরুর তো কোনও ভাই নেই।—কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটে ওঠে বাসন্তীর চোখে।—তবে কি বোনের সঙ্গে তার···। তাই বা কি করে হবে? শুনেছি, মেয়েরা তো সম্পত্তি পায় না!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কিছুটা গলাধঃকরণ করে কমল বলে—আন্দাজটা প্রায় ঠিকই করেছেন। তবে একটু ভুল আছে। মামলা তার বোনের সঙ্গে নয়, মামলা বেধেছে তার মায়ের সঙ্গে! বোনের সঙ্গে মামলা বাধলে বোধ হয় এতটা দুঃখ সে পেত না!

বাসন্তী বলে—বলেন কি! মায়ের সঙ্গে ছেলের মামলা? তার ওপর নিরঞ্জনের মত ছেলে! অসহায়, দুর্বল অথচ প্রতিভাবান্!

চায়ের কাপটা শেষ করে সিগারেটে একটা টান দিয়ে কমল বলে—সংসারে অনেক কিছুই ঘটে বাসন্তী দেবী, যা আমাদের কল্পনারও বাইরে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হলেও তাকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। কারণ তা কঠোর সত্য।

—এই মামলার কারণ কি কমলবাবু?

কমল বলে—বহুদিন আগে রামকৃষ্ণদেবের একটা কথা পড়েছিলাম, 'যেখানে অর্থ সেখানেই যত অনর্থ'। অর্থই যত অনর্থের মূল—এখানেও তাই। নিরঞ্জনের মা আদালতে অভিযোগ করেছেন যে, নিরঞ্জন নাকি তাঁকে খেতে পরতে দেয় না! এত বড়লোকের স্ত্রী হয়েও তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছে এক দীনা ভিখারিনীর মত। তাই আদালত যেন এর একটা সুবিচার করেন।

প্রথমটা বিস্ময়ে বাসন্তীর মুখ থেকে কোন কথাই বার হয় না। তারপর সে বলে—নিরঞ্জন কি বলে?

—বলবে আবার কি? প্রথমটা সে সব কিছুই মিটিয়ে নিতে চেয়েছিল। এমন কি সে তার মায়ের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতেও চেয়েছিল, কিন্তু ওদের স্টেটের ম্যানেজার ননীবাবু বলেছেন, এ মামলা তাকে করতেই হবে! কারণ আজ যদি সে বিনা বাধায় তার ন্যায্য সম্পত্তি ছেড়ে দেয় তা হলে ওরা মনে করবে সম্পত্তি রক্ষা করার কোন শক্তিই বুঝি নিরুর নেই। সংসারে সে একটা গলগ্রহ।

তাই নিরুকে এই মামলা চালিয়ে যেতেই হবে। মামলা জেতার পর নিরু যা খুশি তাই করতে পারে। তাতে ননীবাবুর কিছু বলবার নেই। কারণ সম্পত্তি নিরঞ্জনের, আর তা সে পেয়েছে বাবার উইলে।

বাসন্তী কমলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুখ দিয়ে তার কোন কথাই বার হয় না। কিছুক্ষণ পরে সে বলে—আচ্ছা, ধরুন কমলবাবু, নিরুর প্রতিপক্ষ যদি কোর্টেতে বলে, নিরু দৃষ্টিহীন, এত টাকার লেনদেন করার ক্ষমতাই ওর নেই, ওদের ম্যানেজার ননীবাবু ওর নামে মামলা চালিয়ে চলেছেন।

কমল বলে—ধরাধরি কেন, নিরঞ্জনের ভগ্নীপতি ব্যারিস্টার অশোক এ ধরনের কথাও মামলাতে তুলেছিলেন। তবে ননীবাবু সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

—কি ভাবে?—বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে।

কমল হাতের সিগারেটটা চায়ের কাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে —অদ্ভুত লোক ছিলেন সুজিতবাবু। পাছে এমনি একটা গোলমাল হয় সেই জন্যে গোপনে দানপত্র তো লিখে দিয়েছিলেনই তার ওপর একখানা চিঠিও লিখে রেখে গেছেন। দাঁড়ান, সেটার নকল আমার পকেটেই আছে, পড়ে শোনাচ্ছি। এই দেখুন, এতে পরিষ্কার লেখা আছে—"যে সম্পত্তি আমি নিজে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তাকে আমার ইচ্ছেমত বণ্টন করি, সে অধিকার আমার কোথায়? যদি এই সম্পত্তি আমার নিজের রোজগারে গড়ে উঠতো তা হলে একে খণ্ডিত করার অধিকারও আমার ছিল। তা যখন গড়ে ওঠেনি, তখন আর ছেলেকে বঞ্চিত করার অধিকারও আমার নেই। আমি জানি আমার মৃত্যুর পর আমার অসহায় ছেলের উত্তরাধিকার নিয়ে এরা মামলা করবে। তাই তাকে রক্ষা করবার জন্য আমার বিশ্বাস-ভাজন ম্যানেজার ননীকে ভার দিয়ে যাচ্ছি। তার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। কিন্তু তবুও আমার স্নেহের দান হিসেবে তাকে দিয়ে গেলাম ধর্মতলা স্ট্রীটের এই বাড়িখানা, যে বাড়িখানা আমি কিনেছিলাম আমার কয়লার খনির ব্যবসার প্রথম লাভের টাকা থেকে। আশা করি এতে আমার পুত্রের আপত্তি হবে না।"

কমল থামে। বাসন্তী এতক্ষণ কমলের কথাগুলো গিলছিল। কমলকে থামতে দেখে সে প্রশ্ন করে—তা হলে নিরঞ্জন এখন কি করে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কমল বলে—আমিও কয়েক মাস কোলকাতায় নেই, নিরঞ্জনের কয়লাখনির দেখাশোনার ভার আমার হাতে দিয়েছে তো। দিন চারেক আগে কোলকাতায় এসে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখি এই কয়েক মাসে সে বেশ রোগা হয়ে গেছে। তার অত সুন্দর ফরসা মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে।

হিসেবগুলো বোঝাতে চাইলাম। সে "পড়" বলে অন্যমনস্ক হয়ে রইলো। হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। সে শুনছে না দেখে আমি বললাম—এদিকে একটু মন দাও নিরু।

ছোট ছেলের মতন সে কেঁদে ফেলে বললো—টাকায় আমার কি হবে কমল! লোকে টাকা চায় স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা, বোনকে প্রতি-পালন করবার জন্যে,—আমার তো কেউ নেই। বাসন্তী আমাকে ছেড়ে গেছে,—আর মা, দিদির কথা শুনে আমাকে ভুল বুঝলো। এর পরেও তুমি বলছো টাকার আমার হিসেব দেখতে হবে?

সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলি—সব মিটে যাবে।

নিরঞ্জন বললো—পাথরে দাগ পড়লে তা কি মোছে কমল? শত চেষ্টা কর, সে দাগ চিরদিন জ্বলজ্বল করবে। বাইরের লোকে চিরদিন জানবে, আমি আমার নিজের অসহায়া বিধবা মাকে বঞ্চিত করেছি। আর মা, তিনি—কথাটা আর সে শেষ করতে পারলো না।

হঠাৎ বিস্মিত হয়ে কমল বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে তারও চোখে জল—অঝোরধারে তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কমল চুপ করে থাকে।

কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। চোখের জল মুছে ফেলে বাসন্তী মিনিট দুয়েক পরে বলে—তা হলে তাকে এখন সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই?

কমল কোনও কথা না বলে মাথা নেড়ে জানায়—না।

বাসন্তী তখন অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। সে বলে—তাই বুঝি সে এবারে গানের জলসাতে যোগ দেয়নি?

অত দুঃখেও কমলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে? সে বলে—যোগ দেবে কি! একদিকে পরীক্ষা অপর দিকে মনের অশান্তি। গান সে গাইবে কি করে! তার অত সাধের বেহালাটা যেটাকে সে

ভালোবাসতো তার প্রাণের চেয়ে বেশী, সেটা সেদিন দেখলাম তার ঘরে পড়ে রয়েছে। চেহারা দেখে মনেই হয় না সেটাতে কিছুদিনের মধ্যে কেউ হাত দিয়েছে। বাক্সর ওপর এককাঁড়ি ধুলো জমেছে।

একথা সেকথার পর নিরঞ্জনকে বলি—বেহালাটা আর বাজাও না কেন নিরু? যন্ত্রগুলো দেখে মনে হচ্ছে গান-বাজনার আসরও অনেকদিন বন্ধ করে দিয়েছ। কি নিয়ে বাঁচবে তুমি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললো—সেইটাই আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন আমার জীবনে কমল।

আমি বলি—তুমি প্রতিভাবান শিল্পী, তা ছাড়া মেধাবী ছাত্র। তোমার বাঁচবার জিনিসের অভাব! ভগবানের আশীর্বাদে তোমাকে অর্থচিন্তাও কোনওদিন করতে হয় না।

অত দুঃখেও সে হেসে ফেলে বলে—সেই জন্যেই বোধ হয় আমাকে অনর্থের চিন্তা করতে হয় বেশী। কমল, জানি সব, কিন্তু বলো তো ভাই, কোর্টে সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে আমারই মা আমারই বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলো। তাও আবার আমার নিজের মায়ের পেটের বোনের প্ররোচনায়। এটাকে ভুলবো কেমন করে? বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার শিল্পীজীবনেরও ঘটেছে অপমৃত্যু। সেই জন্যে তো আজকাল আর রেডিও, রেকর্ড, গান-বাজনার আসর ইত্যাদি কোথাও যাই না। ভালও লাগে না। এম. এ. পরীক্ষাটাও দিতাম না, শুধু দিয়েছি বাবা ভালবাসতেন বলে। কমল, আমার নাম যশে খুশী হতেন বাবা, আর, মনে হয় খুশী হতো বাসন্তী। কে জানে এটা আমার ভুল কি না!

তাকে একরকম উৎসাহ দেবার জন্যই বলি—মনে হয় কেন বলছ? সত্যিকারই সে খুশী হয়!

খানিকটা চুপ করে থেকে সে বলে—সে কথা তোমার মতন আমি যদি বিশ্বাস করতে পারতাম তা হলে আমিও তোমার মতনই

খুশী হতাম। এই সুন্দর পৃথিবীটা আমার কাছে হয়তো স্বাদ-গন্ধ হীন বিশ্রী মনে হতো না। তোমাদেরই মত তাকে সুন্দর অনুভব করতে পারতাম।

একবার ভাবলাম বলি কমলকে সেই ইনস্টিটিউটের কথাটা। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করার কথা। তাই সে কথা বলতে পারলাম না। একটা সান্ত্বনার কথাও আমার মুখে এলো না। আপনার মতন না হোক, আমিও তো তাকে ভালবাসি। সে দুঃখ পেলে আমারও তো দুঃখ হয়!

ধীরে ধীরে বাসন্তী প্রশ্ন করে—আমার এখন কী করা কর্তব্য?

একটু বিদ্রূপের সুরেই যেন কমল বললো—সে কথা কি আমি বলে দেব? বলে দিলেই বা আপনি শুনবেন কেন? তা ছাড়া আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন কি? হয়তো নিরঞ্জনের এজেন্টও মনে করতে পারেন।—কথাগুলো শেষ করে হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে কমল বলে—বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেল, হাতেও অনেক কাজ আছে, কাল পরশুর মধ্যেই আমাকে ফিরে যেতে হবে কোলিয়ারি এলাকায়। আজ উঠি।

স্তম্ভিত বাসন্তীর মুখ দেখে মনেই হয় না সে কমলের কথাগুলোর অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করেছে। কেবল সে বলে—আপনি যদি তার এই বিপদের সময় চলে যান, তবে কে তাকে সান্ত্বনা দেবে?

কমল বলে—দেখুন, যে যা ভাগ্য করে আসে। নিরঞ্জনের কপালে দুর্ভোগ আছে এখনও, আমি থেকেও কিছু করতে পারব না। তা ছাড়া এই দেখুন না কেন, সুজিতবাবু থাকতে মেয়েকে সাহায্য পাঠাতেন পাঁচশ টাকা করে, আর নিরঞ্জন এখন পাঠাচ্ছে হাজার টাকা করে। কেন সে সবটা চাইবে না? বারণ করেছিলাম, শুনলো না। এ জগতের রীতিই তো এই! মানুষ খেতে পেলেই শুতে চাইবে।

দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমরা দুঃখ পেলে হবে কি!

খানিক কি ভেবে নিয়ে বাসন্তী বলে—আমি যদি তার সঙ্গে দেখা করি?

কমল বলে—আমি বলব, অনেকদিন আগেই আপনার তা করা উচিত ছিল। কেন যে করেননি তা আপনিই জানেন। আর কিছু না হোক, আপনাকে পাশে পেলে তার শিল্পীজীবনের হয়তো এমন অপমৃত্যু হতো না! তা ছাড়া, আজ আপনি দেখা করলে, কতখানি সে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারবে—তা আমি বলতে পারি না। কারণ সে অন্য শিল্পীদেরই মতন একটু ভাবপ্রবণ, আবার জেদী। তাই—

বাসন্তী কমলের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে—সব জানি কমলবাবু, আর এও জানি তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে আমার একটা খুব দেরি হবে না। তবে দেখি ভেবে কি করা যায়।

কমল বলে—তাই দেখুন। যদি কিছু করতে চান যত শিগগির পারবেন করবেন, কারণ সে এখন বড় অসহায়।—কথা শেষ করে কমল উঠে পড়ে। হাতঘড়িটার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে—বেলা অনেক হয়েছে, আমি এখন যাই।

বাসন্তী একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে—দেখুন এত দেরি হবে আমিও ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম দু-একটা কথার পর আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব। কিন্তু তা আর হলো না। কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। একটা অনুরোধ করলে রাখবেন কি? যদি আপত্তি না থাকে তা হলে দুপুরের খাওয়াটা আমার এখানে সেরে যাবেন?

কমল মুখে একটু হাসি টেনে বলে—খেয়ে যেতে পারলে খুশীই হতাম। কিন্তু চার মাস পরে বাড়ি ফিরেছি—মা তো আছেনই, তার

ওপর নতুন লোক ছ' মাস হলো যাকে এনেছি—তারা সকলে মিলে একসঙ্গে বিরক্ত হবে যে! তার ওপর যা সত্যাগ্রহের যুগ চলেছে। যদি সত্যাগ্রহ করে! আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না বোন। সময় মতন একদিন এসে আপনার এখানে খেয়ে যাব। আজ আসি। মনে কিছু করবেন না।—কথা শেষ করে কমল বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আর বাসন্তী? সে তেমনি ভাবেই চেয়ে থাকে কমলের যাওয়ার পথে। উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতেও সে যেন ভুলে যায়।

নিরঞ্জনের এম. এ. পরীক্ষা হয়ে যাবার পরই বাবা আমাকে তার কাছে তাকে পড়ে শোনাবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার কাজ ছিল তাকে পড়ে শোনানো আর যদি সে কিছু লিখতে চাইতো তা লিখে রাখা। পড়তে গিয়ে দেখেছি বাংলা, ইংরেজী, দর্শন, ইতিহাস এ সব বিষয়ের ওপরেই নিরঞ্জনের ছিল সমান ভালবাসা। অতি বড় দুঃখের সময়েও কোনও কিছু পড়তে আরম্ভ করলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে সব দুঃখ ভুলে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি, আর সে অচঞ্চল চিত্তে তা শুনে গেছে।

জমিদারির খাতাপত্র আর কয়লার খনির হিসাবনিকাশও পড়ে শোনানো আমার অন্যতম কাজ ছিল। এই সময় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি তার মেধা বা স্মৃতিশক্তি অনন্যসাধারণ। একবার যে বই সে শুনতো তার কোথায় কি আছে তা পরিষ্কার সে বলে দিতে পারতো। এমনি দুপুরবেলায় একদিন তাকে বসে পড়ে শোনাচ্ছি এমনি সময় এলো তার নামে ডাকে একখানা চিঠি। সে কথা জানাতেই নিরঞ্জন বললো—সুরেশ, দেখ তো চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে।

আমি খামটার দুটো ধার ভাল করে লক্ষ্য করে বলি—খামের গায়ে কিছু লেখা নেই তো। কেবল আছে আপনার নাম।

—চিঠিখানা খুলে দেখ কে লিখেছে।

আমি তার কথায় চিঠিখানা খুলে ফেলি। শেষকালে নাম দেখে বলি—চিঠিখানা আসছে বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে।

: বাসন্তী!—বিস্মিত হয়ে সে বলে।

বাসন্তী যে কে, নিরঞ্জনের সঙ্গে তার যে কি সম্বন্ধ তখনও আমার তা জানা ছিল না। তাই বলি—হ্যাঁ, তাঁরই কাছ থেকে তো দেখছি।

অধীর আগ্রহ নিয়ে সে আমায় বলে—চিঠিখানা পড় তো।

আমি পড়ে যেতে থাকি :

"শ্রীচরণকমলেষু—

নিরঞ্জন, আজকের দিনে, তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে দুটো কথা বলে আসি সে উপায় আর নেই। তবুও এ চিঠি লিখছি কারণ থাকতে পারি না বলে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কিছু অন্যায় করে ফেলি, তাই গোড়াতেই তার জন্যে মাফ চেয়ে নিই। জীবনে যদি কোনও দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন তোমাকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলব, কেন সেদিন অমন করে তোমায় কোনও কথা না জানিয়ে আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম। যাক, যে কথা বলবার জন্য তোমাকে আজ চিঠি লিখছি।

কলেজের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারিনি কোনও দিন। সেই স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। বহুবার তখন তোমাকে বলেছি তুমি কত বড় গাইয়ে, কত বড় শিল্পী। আমাদের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না। কিন্তু আজকাল দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি রেডিও বা কোলকাতার গানের জলসায় তুমি অনুপস্থিত থাকছ। আমার এক উকিল বন্ধুর মুখে শুনলাম তোমার সংসারে নাকি ভয়ানক অশান্তি। মামলাও নাকি শুরু হয়েছে। তুমি শিক্ষিত, তোমায় কোনও কথা বলি এমন বিদ্যেই বা আমার কোথায়?

তবুও যে যাকে ভালবাসে তার বিপদে দুটো কথা না বলে পারে না!

তাই বলছি সুখ আর দুঃখ, দুঃখ আর সুখ—এ তো মানুষের নিয়মিত ব্যাপার। তাতে তোমার মত শিল্পীর অস্থির হওয়া উচিত কি? আর যদি অস্থির হও, তা হলে তোমার শিল্পীজীবনের হবে মৃত্যু। তাতে তোমার কতখানি ক্ষতি হবে জানি না, ক্ষতি হবে সারা দেশের। বাঙলাদেশের তুমিই গর্ব। তাই সমস্ত বাঙলাদেশের পক্ষে আমি তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি তোমার শিল্পীজীবনের এভাবে অপমৃত্যু ঘটতে তুমি কখনও দিও না।

তোমার সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছি, গানকে তুমি কতখানি ভালবাস। সেই গান তুমি আজ ছেড়ে দিতে চলেছ!

আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সাধারণ সুখ দুঃখ আমাদের অভিভূত করতে পারে। তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করে, ভেঙে মুচড়ে কাদার তাল পাকিয়ে দেয়। কিন্তু তুমি তো বন্ধু তা নও। তোমার সুরসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কত লোকের চোখের জল পড়েছে। আবার অন্য সুরের সৃষ্টিতে দুঃখে-ভেঙে-পড়া লোকের মনে তুমি সৃষ্টি করেছ আনন্দের হিল্লোল। আমার কথার জবাবে তুমি হয়তো বলবে স্থায়িভাবে তো তুমি তাদের মনে আনন্দ দিতে পারোনি। তার জবাবে আমি বলবো—সাময়িকভাবেও তো পেরেছ। আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা তো তাও পারে না। এর মধ্যে দিয়েই তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে, আমাদের মত সাধারণের পর্যায়ে তুমি নও। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যে মন ঈশ্বরকে দেবে সে মনে অন্যের স্থান হবে কেন? সংগীত ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ, আর সেই পথের পথিক তুমিই। তাই বলছি তুমি ওঠ, তুমি জাগো। বাইরের কোনও লোককে বুঝতে দিও না তোমার দুঃখের কথা। গান আর লেখাপড়ার মধ্যে তুমি আবার যাও ডুবে। বাইরের পৃথিবীকে

বুঝতেও দিও না, তোমার এই সাময়িক দৌর্বল্যের কথা। দেখবে অশান্তি তোমার কাছে হার মেনে পালিয়ে যাবে। মনে রেখ, কবির সেই কথা—'নাহি ভয়, হবে জয়। বেদনারও হবে শেষ।'

তোমাকে এত কথা লিখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে এ লেখবার আমার অধিকার আছে কি না। যদি কোনও ধৃষ্টতা করে ফেলি তোমার কাছে তাহলে এ চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিও। ভুলে যাবার চেষ্টা করো এ চিঠির কথা। মনে করো এ তোমারই কোন ভক্ত পাগল শ্রোতার প্রলাপ। এতটুকু গুরুত্ব দিও না এই চিঠির ওপর। আর যদি তোমার মনের মধ্যে এই চিঠি এতটুকু দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে তা হলে বুঝবো আমার জীবন সার্থক! কলেজে বহুদিন, হ্যাঁ যৌবনের চপলতায় নিজেকে সংযত করতে না পেরে তোমাকে আমি বলেছি—'আমি তোমায় ভালবাসি!' সে কথার গুরুত্ব সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝেছি। আর বুঝেছি বলেই বলছি, যদি এই চিঠি তোমাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে, তা হলে সার্থক আমার ভালবাসা। চিঠির শেষে আবার লিখছি ঠাকুরের একটা কথা। তিনি বলতেন—'ভগবানের ইচ্ছে ব্যতীত গাছের একটা পাতাও নড়ে না।' অবশ্য এসব কথা তোমার অজানা নয়। তবুও বলি—তাই যদি হয় তবে মিথ্যে চিন্তা করছ কেন? তুমি কি করেছ এই মামলার সৃষ্টি? ভগবানের এই অমূল্য সম্পদ বহুজন্মের সুকৃতির ফলে যা তুমি লাভ করেছ—সেই শিল্পীর জীবন পড়ে ধুলায় লুটাবে, সত্য হবে কেবল তোমার বড়লোকের দাম্ভিকতা আর আমিত্ববোধ? না বন্ধু! তুমি অনেক শিক্ষিত, অনেক বোঝ আমার চেয়েও, বিচার তোমাকে একবার করতেই হবে। কে জানে? এই বিচার করতে হবে বলেই ভগবান তোমাকে হয়তো এতখানি পাণ্ডিত্য দিয়েছেন—যা তিনি অনেক চক্ষুষ্মান লোককেও দেন না!

মুহূর্তের জন্যেও আমার কথাগুলো একবার ভেবে দেখ।

বিপদের দিনে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই এ আমার বহুদিনের ইচ্ছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে তাতে লোকনিন্দার ভয় আছে। বিশেষ করে তোমার শত্রুপক্ষ এখন অনেক। তীব্র সমালোচনায় তোমাকে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে দেবে। আর আমি তো জানি, তুমি শিল্পী, তাই বোধ হয় সহ্য করবার ক্ষমতাও তোমার কম। কখন কি করে বসো তার ঠিক নেই। তাই দেখা করতে পারলাম না। আশা করি ভাল আছ। আমার জন্যে ভেব না। সময় হলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। যতদিন না সময় আসে ততদিন যে আমাদের ধৈর্য ধরতেই হবে। তাই ঠিকানা দিলাম না চিঠিতে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

বাসন্তী।"

চিঠি পড়া শেষ করে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে দেখি, সে যেন আমার কথাগুলো গিলছিল এতক্ষণ। দু'জনেই চুপচাপ, কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করি—যে বইখানা পড়ছিলাম সেটা কি পড়ব ?

নিরঞ্জনের যেন চমক ভাঙলো। সে চমকে উঠে বললো—কি বললে সুরেশ ?

আমি বলি—বইটা কি পড়ব ?

—বইটা ?—নিরঞ্জন বলে—না। তার আগে তুমি আর একবার চিঠিখানা পড়।

চিঠিখানা আবার তাকে পড়ে শোনালাম। আবার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, সে সেটাকে আবার পড়তে বললো।

এবারে পড়া শেষ হলে নিরঞ্জন আমাকে প্রশ্ন করলো—চিঠিখানা পড়তে কোথাও বাদ পড়েনি তো সুরেশ ?

আমি তো স্তম্ভিত ! কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা একবার মাত্র শুনে সে মনে রাখতে পারে, তার পক্ষে সামান্য একটা চিঠি এতবার করে

শুনতে হলো! তার ওপর, আমাকে প্রশ্ন করছে, আমি কোথাও বাদ দিয়েছি কিনা পড়তে।

মনিবের হুকুম। হ্যাঁ, একরকম তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই চিঠিখানা ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর একবার দেখলাম। তারপরে বললাম—নাঃ সবই তো পড়া হয়েছে।

একটু যেন হতাশ হয়ে গিয়ে নিরঞ্জন বললো—সবই পড়া হয়ে গেছে?

—চিঠিটা কি ফাইল করে দেব এবার?

—না না, ওটাকে তোমার ফাইল করতে হবে না। ওটা তুমি বরং আমার কাছে দাও।

আমার কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে সে আঙুল দিয়ে কি যেন স্পর্শ করবার চেষ্টা করলো। তারপর সেখানা ভাঁজ করে নিজের পকেটে রাখলো।

কি বলবো আমি? এমন ব্যবহার তো সে কখনও করে না। তারপরে খানিকক্ষণ পরে সে আমায় প্রশ্ন করে—আচ্ছা, ছবি দেখলে প্রিয়জনের শোক কি ভোলা যায়?

এ অদ্ভুত প্রশ্নের কি জবাব দেব! তাই বলি—না, তবুও মুখখানা মনে পড়ে তো!

নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—আচ্ছা সুরেশ, তোমরা, যারা দেখতে পাও, তারা শুনেছি হাতের লেখার ওপর নাকি অনেক গুরুত্ব দাও। মানে আমি বলতে চাই—কি যেন, হাতের লেখা দেখলে তোমাদের প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে?

আমি একটু চুপ করে থেকে বলি—প্রত্যেক মানুষের হাতের লেখাই তো আলাদা! কারুর হাতের লেখার সঙ্গে তো কারুর হাতের লেখা মেলে না। তাই, বিশেষ ধরনের হাতের লেখা দেখলে প্রিয়জনের কথা স্মরণ হয় বইকি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বলে—আজ মনে হচ্ছে সুরেশ, আমরা দৃষ্টিহীনেরা কত অসহায়। ভালবেসে মনে রাখবার অধিকার-টুকুও বুঝি ভগবান আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। কারুর মুখ দেখবার অধিকার নেই, যা কিছু করতে হবে স্পর্শ দিয়ে। বাবা চলে গেছেন, ছবিটা অবধি—ওঃ! যদি একবার দেখতে পেতাম, তা হলে এ দুঃখের সময় হয়তো খানিকটা সান্ত্বনা পেতাম। অথচ একরকম মিছিমিছি পাঁচশো টাকা দিয়ে ওটা তৈরি করে এই ঘরে টাঙিয়ে রাখলাম। যদি তাঁর একটা হাতের লেখাও দেখতে পেতাম! আর ওই বাসন্তীর? কোন চিহ্নই আমি রাখতে পারলাম না! হাতের লেখার চিঠিখানাও যদি পড়তে পারতাম—

তারপরে খানিকক্ষণ চুপ করে বলে—তোমাদের সকলকার একটা সান্ত্বনার জায়গা আছে। কিন্তু আমি এত দুর্ভাগা যে, আমার সেটুকুও নেই। যাক, তুমি ওঘর থেকে আমার বেহালাটা এনে দাও তো।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তাকে বেহালার বাক্সটা এনে দিই।

নিজের মনেই তাতে সুর বাঁধতে বাঁধতে সে বলে—তুমি এখন এসো। যাবার সময় আল্লাজানের বাড়িতে খবর দিয়ে যেও, সে যেন আবার নিয়মিত আগের মতই আসে। নইলে সত্যি বোধ হয় আমি পাগল হয়ে যাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলাম সাহানার অপূর্ব আলাপ। সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝি, তা ধ্বনিত হয়েছিল বেহালা থেকে নয়, নিরঞ্জনের মর্মস্থল থেকে।

আবার আগের মত নিরঞ্জন গানেতে মন দিল। শুধু মন দেওয়াই নয়, তাতে বোধ হয় ডুবেও গেল। আগেকার মতই রেডিও, গ্রামোফোন, গানের আসরে তাকে নিয়মিত দেখাও যেত। এ ছাড়া সে পড়াতে শুরু করলো একটা কলেজে।

সময় একেবারেই পেত না। একটা-না-একটাতে সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতো।

হাইকোর্টের জজ সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করে রায় দিলেন, সম্পত্তি নিরঞ্জনেরই। এর ওপর তার মা বা বোনের কোন অধিকার নেই। কারণ হিসেবে তিনি বললেন—সে সম্পত্তি নিরঞ্জনের পৈতৃক। তার ওপর সুজিতবাবু মৃত্যুর সময় বিশেষ দানপত্র করে গেছেন। তা ছাড়াও নিরঞ্জন অন্ধ হলেও সম্পত্তি পরিচালনার যোগ্যতা সে রাখে। কারণ চোখে না দেখলেও কোনও চক্ষুষ্মান লোকের চেয়ে তার শক্তি তো কম নয়। বরং অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু।

জজ সাহেবের এই রায় শুনে মাধুরী আর তার স্বামী বোধহয় হতাশ হয়েই পড়লো। কিন্তু নির্মলা দেবীর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কারণ ব্যাপারটা যে কি ঘটলো তা হয়তো তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝতেও পারলেন না।

সময় সময় মানুষের জীবনে এমন এক একটা ব্যাপার ঘটে যেটার কারণ তারা অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে কিনা সন্দেহ। কি তারা করছে, কেন করছে, লাভই বা কি হবে, না বুঝেই অনেক সময় মানুষ করে যায়। তারা বোঝে কেবল নিজেদের জেদ। এই জেদের ফলে সময় সময় মানুষের মনের সুস্থতাও নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে অস্বাভাবিক আচরণ করলে সাধারণ মানুষ চুপ করে থাকতে পারে, চুপ করে থাকে না কেবল প্রকৃতি। সে খালি অপেক্ষা করে সময়ের। সময় পেলেই সে ঘুরে দাঁড়ায়। কঠোর হস্তে চালাতে শুরু করে কশাঘাত। আর সেই কশাঘাতের ফলে মানুষ প্রথমটা করে হাহুতাশ, পরে জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে পারিপার্শ্বিক আর ভগবানকে দেয় অভিশাপ। শেষে কোন কিছু না পেয়ে হারায় তার বিচারশক্তি। তখন সুস্থ মানুষের সমাজেও সে হয় অচল।

এত কথা বলবার প্রয়োজন হতো না, যদি নির্মলা দেবীকে

চোখের ওপর না দেখতাম। কন্যাকে তিনি বেশী ভালবাসতেন, না কন্যা সম্পত্তির লোভে খোশামোদ করে তাঁর স্নেহের পাত্রী হয়েছিল, সে কথা আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে ঘটনা যেটুকু জানতে পেরেছি সেটুকুই পাঠকদের কাছে নিবেদন করব।

কোর্টের রায় বেরুবার পর থেকেই মাধুরীর সে বাড়িতে আসা কমেছিল।

শুনেছিলাম, নির্মলা দেবী নাকি অস্থির হয়ে বলেছিলেন, এ বাড়ি তো খোকা মামলায় জিতে নিলে, আমার এতটুকু অধিকার আর রইলো না। তবে আর মিথ্যে এ বাড়িতে কেন থাকি! জীবনের বাকী কটা দিন, খুকী, আমি তোরই কাছে কাটাব।

উত্তরে নাকি মাধুরী বলেছিল—তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে তো ভালই হতো, আমিও খুশী হতাম, তবে আমার অবস্থাও তো বুঝছ মা, পৈতৃক বাড়ি যেটা উনি পেয়েছেন, সেটা হয়তো এবার ভাড়া দিতে হবে। তোমার জোর ছিল, এতদিন ভাবতাম মা-বাপের কাছে বুঝি ছেলে-মেয়ে দু'জনেই সমান। কিন্তু বাবা যা করে গেলেন,—

তারপরে নাকি উদ্গত অশ্রু চাপতে চাপতে আরও বলেছিল—খোকা চোখে দেখে না, ননীবাবু ঠকিয়ে লুটেপুটে নিচ্ছে—সেইজন্যেই তো এই মামলা করেছিল ওর ভগ্নীপতি। সব সময় গোমস্তা কর্মচারীর হাতে থাকার চেয়েও নিজের আত্মীয়ের কাছে থাকা ভাল নয় কি? এখন যা হবার হোক! খোকা ভাবলে আমরা লুটেপুটে নেব। তাই মামলা চলতে দিলে। ওর যদি তোমার প্রতি এতটুকু ভালবাসা থাকতো মা, তা হলে কি ও মামলা করতে পারতো? ওর উচিত ছিল না কি, মামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বলে এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়া, ক্ষমা চেয়ে নেওয়া? তা কি একবারও করলো! কী অহংকারী ছেলে রে বাবা!

কাঁদতে কাঁদতে নির্মলা দেবী বলেন—দেখ খুকী, দেখ। আমার

ভাগ্যটা একবার দেখ। বুড়োবয়েসে শেষকালে আমায় থাকতে হবে কিনা ছেলের হাততোলা হয়ে! উনি যে এমন করতে পারেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেই তাঁর সর্বস্ব, আমি কেউ নই। হবে না কেন, কি রকম বংশের ছেলে দেখতে হবে তো! এ বংশের কোন ছেলে বৌয়ের মুখের দিকে কি চেয়েছে, যে উনি আবার নতুন করে আমার মুখের দিকে চাইবেন! এই যে খোকা, ওই রক্ত গায়ে আছে বলে তেজ দেখিস না! দু'দণ্ড আমার কাছে এসে বসে! না, মা বলে কথা বলে! আমারও মনটা তো চায়। অথচ আমরা জানি, নিরঞ্জন কোনও দিনই এমন ব্যবহার তাঁর সঙ্গে করেনি।

ছেলেবয়স থেকেই নিরঞ্জন দৃষ্টি হারিয়েছিল। তাই শব্দ কানে শোনাই তার পক্ষে ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

নিরঞ্জনের ওপর রাগ করে কতদিন নির্মলা দেবী সামনে দাঁড়িয়েও তার মা মা ডাকে সাড়া দেননি।

মালতী দেবী এই নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে তিনি ঝংকার দিয়ে বলেছেন—কেন ও ছেলে বুঝতে পারে না?

হায় রে, যদি বুঝতেই পারবে, তা হলে অত ব্যাকুলভাবে কি সে মা বলে ডাকে!

এর পরে কেটে গেছে কতদিন। বাইরে হাসিখুশী নিরঞ্জন, বাড়িতে হয়েছে গম্ভীর। তাকে সব চাইতে বেশী আঘাত করেছিল, যে রাত্রে সে নিজের কানে শুনেছিল, তাকে দামী বোতাম আর আংটি কিনে দেওয়ার জন্য তার মা ভৎ'সনা করছেন সুজিতবাবুকে। যেটুকু কথা না বললে নয়, সেইটুকু কথাই সে তারপর থেকে বলতো। আর বোধ হয় মনে মনে ভাবতো, তার মা তাকে ভালবাসে না তার একমাত্র কারণ তার অন্ধত্ব, যা সে পেয়েছিল ভাগ্যের বিড়ম্বনায়।

বাসন্তীকে হারিয়েও সে সেই কথাই ভেবেছিল। সে বুঝি তাকে ছেড়ে গেছে ওই অন্ধত্বের জন্যে। কিন্তু বাসন্তীর চিঠি পাবার পর

থেকে তার মনে বোধ হয় অন্য ভাব এসেছিল। তাই এত শোকের মাঝখানেও সে আবার ধরেছিল বেহালা, ভুলে গিয়েছিল তার শোক-দুঃখ। গান আর লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থেকে সে ভোলবার চেষ্টা করেছিল সকল দুঃখ।

কিন্তু নিরঞ্জনের মনোব্যথা কেউ বুঝলো না। সকলেই তাকে বিচার করলো নিজের বুদ্ধি অনুপাতে।

ঠিক এমনি সময় আমার পিতৃদেবও করলেন একটি ভুল, যে ভুলের জের বয়ে বেড়ালো নিরপরাধ নিরঞ্জন।

আর আমার বাবা? একটুখানি হাহুতাশ করে চোখ বুজলেন চিরদিনের জন্য। অবশ্য এই কথা দ্বারা আমি এ কথা বলতে চাইনি যে তিনি নিরঞ্জনকে ভালবাসতেন না, ইচ্ছে করে তার জীবনের সকল অশান্তি ডেকে এনেছিলেন।

আমি এইটুকু বলতে চাই, যে কাজ তিনি নিরঞ্জন সুখী হবে বলে করেছিলেন, তা-ই নিরঞ্জনের জীবনে এনেছিল চরম নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ। নিরঞ্জনকে তিনি ভালবাসতেন পুত্রেরও অধিক। তার ওপর নিরঞ্জনের সাংসারিক ব্যাপার, মানসিক অশান্তি কিছুই তাঁর অজানা ছিল না।

মৃত্যুর সময় সুজিতবাবু অনুরোধ করেছিলেন আমার বাবাকে, নিরঞ্জনকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে। সেই জন্যেই বোধ হয় বাবাকে তিনি আমাদের এই বিশাল বসতবাড়িটা দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সেইটাই বোধ হয় মানুষের ভাগ্য। আর এই ভাগ্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দিয়ে ওড়ানো যায় না, আবার সপক্ষে কথা বলে তাকে প্রতিষ্ঠিতও করা যায় না। তাকে মেনে নিতে হয় নীরবে, অশ্রুর মধ্যে।

এত কথা বলতাম না, বলার প্রয়োজনও ছিল না—যদি আমি না দেখতাম, আমারই বাবাকে, মৃত্যুর সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে—

হায়, কি ভুলই করলাম, ছেলেটার জীবন একেবারে অশান্তির সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে গেলাম!

যাক, যা বলছিলাম।

আমার বাবা একদিন নিরঞ্জনের কাছে এসে বললেন—নিরু, একরকম সব ঝঞ্ঝাটই চুকলো, কোলিয়ারির ভার কমল নিয়েছে, সেদিকে চিন্তারও কিছু নেই। ছেলেটির সঙ্গে এই ক'বছর কাজ করে দেখলাম ছেলেটি বিশ্বাসী আর তোমাকে ভালওবাসে। আর তোমার এদিকে বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্যে রইলো সুরেশ। হাতে করে তাকে কাজ শিখিয়েছি। এইটুকু ওার বলতে পারি, সে আর যাই করুক তোমার সঙ্গে প্রতারণা করবে না। দু' এক বছরের সে তোমার চেয়ে বড় বটে, কিন্তু মনে মনে সে তোমায় শ্রদ্ধাই করে। আমার ছেলে বলে বলছি না, তাকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই একথা বললাম।

তোমার বাবা আমাকে যে ভার দিয়ে গেছেন, অক্ষরে অক্ষরে আমি তা পালন করেছি। স্বর্গ থেকে তিনি দেখছেন, আমি তাঁর কথা রেখেছি কিনা। তবে একটা কথা এইবারে তোমায় আমি বলতে চাই। শুধু বলতে চাই নয়, এটা আমার অনুরোধ। গিন্নীমারই একথা বলা উচিত ছিল, তবে তাঁর মতিগতি এখন,—তোমার মত পেলে আমি নিজেই তাঁকে জানাব।

নিরঞ্জন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়ে বলে—কি বলছেন কাকাবাবু, বলুন। আপনার মতন এ পৃথিবীতে আমার হিতৈষী আর কে আছে?

বাবা একটু কেশে নিয়ে বলেন—আমি একটি সদ্বংশের মেয়ে দেখেছি। তাদের অবস্থা একসময় ভালই ছিল, আজ পড়ে গেছে। তা চিরদিন তো মানুষের সমান যায় না। মেয়েটি দেখতে শুনতেও ভাল। বছর দুয়েক আগে বি. এ.-ও পাস করেছে, তোমার যদি মত থাকে তা হলে আমি গিন্নীমাকে বলে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাই।

নিরঞ্জন খানিকটা কি যেন ভেবে নেয়, তারপরে বলে—যে মেয়ে বি. এ. পাস করেছে সে সহজে অন্য জায়গায় রোজগার করে নিজের ভরণপোষণ করতে পারবে। আমাকে বিয়ে করতে কেন সে রাজী হবে ?

বাবা বোধ হয় প্রথমে কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাই বলেন—না-রাজী হবারই বা কারণ কি ; এমন পাত্রে মেয়ে দিতে পারলে তারা তো ধন্য হয়ে যাবে !

নিরঞ্জন বলে—তা বটে। এতগুলো কোলিয়ারির মালিক আমি, কোলকাতা আর রায়গঞ্জে জমিদারিও কম নয়। কাকাবাবু, ধন্য তারা হতো সত্যি, তবে যদি আমার চোখ থাকতো। তবে এখন কি তারা সে মতবাদ পোষণ করবে ? বরং শুনে ঘৃণায় নাক সিঁটকাবে। তখন দুঃখ পাবেন আপনি।

সব ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বাবা বলেন—না না, তুমি সে সব কিছু ভেব না। মেয়েটির বাবার সঙ্গে আমি ইতিমধ্যে কথা একবার বলেছি। মেয়েটিও রাজী আছে। এখন তুমি মত দিলেই হবে।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে নিরঞ্জন বলে—মেয়েটিও রাজী আছে ? আপনি ঠিক কথা বলছেন ?

উত্তরে তিনি বলেন—হ্যাঁ রাজী আছেই তো ! তার সম্মতি না পেলে আমি কি তোমাকে একথা বলতে পারি ?

নিরঞ্জন আবার কি যেন ভাবে, তারপরে বলে—আপনি মাকে বলে দেখুন, তিনি কি বলেন। তিনি যদি এ বিয়েতে রাজী হন, তা হলে করুন আপনার যা খুশি ! তবে যদি সম্ভব হয়, বিয়ের আগে মেয়েটির সঙ্গে একবার আমার দেখা হলে ভাল হয়।

তিনি বলেন—নিশ্চয়ই ! তোমার মা যদি রাজী থাকেন, তা হলে বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে মেয়েটির যাতে দেখা হয় তার চেষ্টা আমি করব।—কথা শেষ করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আসল ঘটনাটা যা আমি পরে জানতে পেরেছি, তাই এখন তুলে ধরছি পাঠকদের সামনে। অবশ্য এ ঘটনা আমি পেয়েছিলাম আমার বাবারই ডায়েরী থেকে।

কোলকাতায় থাকতেন মাধববাবু। পৈতৃক সম্পত্তিও তাঁর যথেষ্ট ছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল, সেই চিরপরিচিত বনিয়াদী বলে গণ্য তিনটি দোষ—মদ, স্ত্রীলোক আর রেস।

পুরুষ প্রথমে স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়। কারণ তারই মধ্যে সে খুঁজে পায় বিশ্বের যত বিস্ময়। সেই নারীর দ্বারাই তার চরিতার্থ হয় আদিম প্রবৃত্তি। আর মোহিনীর রূপজালে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার একমাত্র বন্ধু 'মদ', যা অতি আদিম যুগেও দেবতাদের মধ্যেও 'সোমরস' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মদের নেশায় বিভোর হয়ে সে দেখে নানান রঙীন স্বপ্ন। এই স্বপ্নের মায়াজাল একদিন ছেঁড়ে যেদিন সে আবিষ্কার করে তার তহবিল শূন্য হতে চলেছে। তাকেই বোধ হয় পূর্ণ করবার জন্য সে ধরে বাজি। জুয়াখেলায় হয় সে সর্বস্বান্ত।

মাধববাবুর জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি একরকম, পুত্রকে নিঃসম্বল করেই বেশ খানিকটা ঋণের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, তিনি চোখ বোঁজেন এ পৃথিবীতে।

পুত্র বিভাস সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাইতে কোনরকমে একটা সওদাগরী অফিসে চাকরি পান। খাতকরা ছাড়বে কেন? একে একে তাঁর প্রায় সব সম্পত্তি নিলামে উঠলো। একরকম জলের দামে তা বিক্রিও হয়ে গেল। বিভাসবাবু চেয়ে চেয়ে কেবল দেখলেন। শেষ পর্যন্ত টান পড়লো বসতবাটির ওপর।

সুশীলবাবু বিভাসবাবুর পক্ষে অ্যাটর্নী। তাঁকে বোঝালেন, যদি হাজার কুড়িক টাকা দিয়ে এখন খাতকদের দৃষ্টি থেকে বাড়িটাকে বাঁচানো যায়, তা হলে ভবিষ্যতে বাড়িটা বেশী দামে বিক্রি হতে পারে।

তা ছাড়া, বিভাসবাবুঃও যদি ভাগ্য খুলে যায় এর মধ্যে তা হলে ঋণের টাকাটা মিটিয়ে দিলেই বসতবাড়িটা রক্ষা পেতে পারে ভবিষ্যতে।

মানুষ বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের আশায়। আর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই মানুষের কাজকর্মে আছে উৎসাহ, নইলে কি যে হতো, তা কে বলতে পারে!

সুশীলবাবু বিভাসবাবুকে এই কথা বলায় তিনি অকূলে কূল পেলেন। কিন্তু তেমন মহাজন পাওয়া যায় কোথায়!

বিভাসবাবুর আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন তাঁরা বিপদ বুঝে, বিভাসবাবুর আত্মীয়তা করলেন অস্বীকার। সংসারে এটা নতুন নয়, এমন ঘটেই থাকে। সমস্যার সমাধান করে দিলেন সুশীলবাবু নিজেই।

তখনকার দিনে চড়া সুদে টাকা খাটানো আজকের মত নিন্দনীয় ছিল না। বিত্তবান বহু লোকই সে কাজ করতেন। সুজিতবাবুও উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁর অ্যাটর্নীর সাহায্যে খাটাতেন। দু'একটা ছোটখাটো কাজ করার দরুন, অ্যাটর্নী সুশীল ঘোষের সঙ্গে সুজিতবাবুর পরিচয় ছিল। তিনিই মধ্যস্থ হয়ে সুজিতবাবুকে অনুরোধ করেন বিভাসবাবুকে এই টাকাটা ধার দেবার জন্যে।

কথা ছিল, বিভাসবাবু সুবিধামত টাকাটা শোধ দেবেন। কিন্তু সুজিতবাবুর অ্যাটর্নী খালিহাতে টাকাটা দিতে রাজী হলেন না। তাই বিভাসবাবুর বাড়ি আবার বাঁধা পড়লো। সেই সূত্রেই আমার বাবা বিভাসবাবুর সঙ্গে হন পরিচিত।

ইদানীং নিরঞ্জন সম্পত্তি পাওয়ার পর, সুজিতবাবুর সমস্ত পাওনা টাকার উদ্ধারের জন্য বাবা মামলা দায়ের করেন। কেবল করেননি বিভাসবাবুর সঙ্গে। কারণ, বিভাসবাবুর একটি মেয়ে ছিল, যাকে দেখে বাবা মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং মনে মনে তাকে নিরঞ্জনের জন্যে পাত্রী হিসাবে পছন্দ করে রেখেছিলেন।

মেয়েটির নাম ছিল সন্ধ্যা। এইখানে তাঁর ডায়েরীর ভাষা তুলে দিচ্ছি :

"সুজিতবাবুর মৃত্যুর পর আমি বিভাসবাবুর বাড়ি যাই টাকার তাগাদায়। কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে এসে বলে—বাবা তো বাড়ি নেই।

আমি বলি—এখুনি ফিরবেন কি ?

মেয়েটি উত্তরে বলে—ঠিক তো নেই, এখুনি ফিরতেও পারেন। আপনি যদি অপেক্ষা করতে চান, বাইরের ঘর খুলে দিচ্ছি, এসে বসুন।

মেয়েটিকে দেখে কেমন যেন ভাল লাগলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল নিরুর কথা। যদি বিভাসবাবু রাজী হন, তা হলে নিরুর সঙ্গে ওকে মানাবেও ভাল।

তাই একরকম আলাপ জমাবার জন্যেই তাদের বাইরের ঘরে বসে প্রশ্ন করি—তোমার নাম কি মা ?

মেয়েটি বলে—আমার নাম সন্ধ্যা।

—কি কর তুমি ?

উত্তরে সন্ধ্যা বলে—থার্ড ইয়ারে পড়ি।

—বাঃ, কোন্ কলেজে পড় তুমি ?

—আজ্ঞে, বেথুনে।

—ভাল।

আমি ভাবতে থাকি নিরঞ্জন তো এখন এম. এ. পড়ছে। তা ছাড়া,—যাক সে সব কথা। আভাসে একবার বিভাসবাবুকে বললে কেমন হয় !

বসে রইলাম সেদিন অনেকক্ষণ।

মেয়েটির চালচলন, হাবভাব লক্ষ করবারও সুযোগ পেলাম। ভালই লাগলো। একথা সেকথার পর জানতে পারলাম মেয়েটি

রবীন্দ্রনাথের গানও ভাল গায়। মনে হলো একে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলে নিরু সুখীই হবে।

সেদিন অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর উঠে পড়লাম সেখান থেকে। তারপর বিভাসবাবুকে কথাটা বলব বলব করে বলাও হয়নি। কারণ এরই কিছু পর থেকে শুরু হয়েছিল নিরঞ্জনের সঙ্গে তার মায়ের মামলা।

দীর্ঘ চারটে বছর কিভাবে যে আমার কেটেছে তা জানেন জগদীশ্বর।

নিরুর যেদিন মামলায় জিত হলো, সেদিন মনে হলো এইবার আমার সময় এসেছে রায়পরিবার থেকে অবসর নেবার। রমেশ কাজ শিখেছে, ওদিকে কমলও বেশ বিশ্বাসী। একরকম ওরাই চালিয়ে নিতে পারবে। তবে যাবার আগে নিরুকে সংসারী করে যাওয়া আমার কর্তব্য। তাই বিভাসবাবুকে কথায় কথায় একদিন বললাম—সন্ধ্যা তো বি. এ. পাস করলো। শুনতে পাচ্ছি পাড়ার একটা মেয়ে-স্কুলে নাকি সে চাকরিও নিয়েছে। তা, ওর বিয়ের ব্যবস্থা কিছু করতে পেরেছেন ?

বিভাসবাবু একটু মাথা চুলকে জবাব দেন—আজ্ঞে, ইচ্ছে তো যথেষ্ট রয়েছে, কোন্ বাপে আর না চায় তার মেয়ে সৎপাত্রস্থ হোক। তবে আপনি তো জানেন সব কথা, টাকারও তেমন যোগাড় নেই, আর—

আমি বলি—আর কি বলুন বিভাসবাবু !

—আর তেমন সৎ পাত্রই বা পাই কোথায় !

—তেমন ভাল ছেলের খবর পেলে আপনি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হবেন ? ধরুন ছেলের বয়স সাতাশ-আটাশ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটা পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে পাস করেছে। এমন পাত্র পেলে মেয়ের আপনি বিয়ে দেবেন কি ?

বিভাসবাবু বলেন—তাঁদের দাবি যদি বেশী থাকে ?

—দাবি ? একেবারেই নেই, বরং গয়নাগাঁটি, বিয়ের খরচ তাঁরা দিয়ে আপনার মেয়েকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে যাবেন।

বিভাসবাবু বলেন—বলেন কি, এমন পাত্র আপনার সন্ধানে আছে ?

—আছে মানে ? আমি উল্লসিত হয়ে বলি—হাতের কাছেই আছে। তবে—

বিস্মিত হয়ে গিয়ে বিভাসবাবু বলেন—তবে কি ননীবাবু ?

—ছেলেটি চোখে দেখে না।

ঝরা ফুলের মত শুকিয়ে গিয়ে বিভাসবাবু বলেন—বেশ ! একবার এ ব্যাপারে সন্ধ্যার মতামত নিতে হবে। ছেলেটি কে ননীবাবু ?

—আমারই মনিব—নিরঞ্জন রায়।

—নিরঞ্জন, বিখ্যাত গাইয়ে ?

—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। নিরু আমার বড় ভাল ছেলে। যদি সন্ধ্যা মা রাজী হয় তা হলে দুটিকে মানাবে ভাল। তবে আপনাকে আমি একথা বলছি বিভাসবাবু, এমন ছেলেকে জামাইরূপে পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা।

এর কিছু পর সন্ধ্যার সম্মতির কথা বিভাসবাবুই আমাকে জানান। তারপর আমিই নিরুর কাছে কথাটা তুলেছিলাম।”

এর পর আমার বাবা নির্মলা দেবীর কাছে যান। কতখানি তিনি তাঁর কথা শুনেছিলেন জানি না, তবে মুখ ফিরিয়ে জবাবে বলেছিলেন—খোকার বিয়ে দিতে চান, ভালই। তবে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ? তাকে বলুন। আমার মতামতের কোন অপেক্ষাই তো সে রাখে না।

আমার বাবা বলেন—বলেন কী ! নিরু আপনার তেমন ছেলেই নয়। আপনাকে সে যথেষ্ট সম্মান করে।

সংসারে একধরনের লোক আছেন যাঁদের কথার প্রতিবাদ করলে

তাঁরা যান রেগে। যুক্তি দিয়ে কোন কিছুই বুঝতে চান না। অথচ তাঁদেরই বড় করে কথা বললে তাঁরা হন সুখী।

নির্মলা দেবীর চরিত্র প্রথম দিকে এইরকমই ছিল। কোন কিছু যুক্তি তিনি বুঝতেন না, মানতে চাইতেন না। সব কিছুর মধ্যে খুঁজে বেড়াতেন নিজের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক সমীক্ষকদের মতে এটা যদিও একটা মানসিক রোগের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু তখন মানুষ তা বুঝতো না। কারণ মনস্তত্ত্ব তখনও এদেশে ভালভাবে চালু হয়নি।

এই জন্যেই মাধুরী জয় করেছিল তার মাকে, আর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী নিরঞ্জন তা পারেনি।

ধীরে ধীরে নিরঞ্জন তাই সরেও গিয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে বহু দূরে। আর পুত্রকে কাছে না পেয়ে অভিমানকে বড় করে যে মর্মান্তিক ঘটনা নির্মলা দেবী আর নিরঞ্জনের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, তা আগেই বলেছি।

যাক, এখন ফিরে যাওয়া যাক পুরনো কাহিনীতে।

সুজিতবাবুর সঙ্গে বহুদিন কাটানোর ফলে, আর রায়পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে থাকার জন্যেই বাবা জানতেন নির্মলা দেবীর চরিত্র। তাই তাঁকে একরকম খুশী করবার জন্যে তিনি বললেন—আপনি ছাড়া নিরঞ্জনের কে আছে বলুন ? তা ছাড়া আপনি তার মা! ছেলে যদি বেশী অন্যায় করে, মা কি বেশীক্ষণ মনে করে রাখে ? আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী। আপনার কর্তব্যও তো তাকে সংসারী করা। এখন আপনি যদি না দাঁড়ান, তা হলে সে যে ভেসে যাবে!

এসব কথায় সাধারণতঃ মানুষের মন গলে। বার বার ওই ধরনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে নির্মলা দেবীরও মন গললো। তিনিও রাজী হলেন পাত্রীকে দেখে আশীর্বাদ করে আসতে।

একটা কাহিনী আগে বলা হয়নি। আমার বাবা বিভাসবাবুর কাছ থেকে সন্ধ্যার মতামত যা পেয়েছিলেন, তাতে ছিল একটা

জমিদারী চাল। চালটা আর কিছুই নয়, বিভাসবাবুকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, সন্ধ্যার সঙ্গে যদি নিরঞ্জনের বিয়ে হয় তা হলে 'বন্ধকী' দলিলটা তিনি ছিঁড়ে ফেলবেন, আর তার ফলে বিভাসবাবুর ভদ্রাসন রক্ষা পাবে।

স্বার্থ এমন জিনিস যে সে চায় নিজের পরিতৃপ্তি। সে সন্তানের মুখ চায় না। ভালবাসার স্থান সেখানে নেই।

তাই বোধ হয় বিভাসবাবু সন্ধ্যার নামে যে অনুমতির কথা আমার বাবাকে জানিয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রসূত।

কিন্তু কল্পনায় বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগাযোগসূত্র তার নেই। মানুষই অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। নিজের দুঃখদৈন্যের কথা জানিয়ে বিভাসবাবু শরণাপন্ন হলেন তাঁর কন্যার। কিন্তু কলেজে পড়বার সময় তাদেরই পাড়ার একটি ছেলেকে সন্ধ্যা মনোনীত করেছিল তার স্বামিরূপে। তার নাম অম্লান।

অম্লান লেখাপড়ায় ভাল ছিল না কোনদিনই। চার-পাঁচবার ইন্টারমিডিয়েটে ঘা খেয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা থেকে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু তবুও সে মেয়েদের কাছে বিশেষরূপে আকর্ষণীয় ছিল। কারণ তার ছিল সুন্দর চেহারা।

এই সুন্দর চেহারাই সন্ধ্যাকে আকর্ষিত করেছিল অম্লানের দিকে। ভাল চাকরি সে পায়নি, পাবার কথাও নয়। তার রোজগার ছিল অত্যন্ত সামান্য। কিন্তু তার একটা গুণ ছিল, তা হচ্ছে ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলা।

মেয়েদের মন কেমন করে জয় করতে হয় তা সে বুঝতো খুব ভালভাবেই। আর সে পৃথিবীতে জানতো কেমন করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে হয়।

এই অম্লানেরই ছিল দারুণ শখ ফিল্মে অভিনয় করা আর তারই পরিচালক হওয়া। কিন্তু এমনই দৈবচক্রান্ত যে, কোনও সুযোগই সে

পেত না। তাই সে ভাবতো টাকা পেলে সে নিজেই একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলবে। কিন্তু তেমন প্রযোজক সে পায় কোথায়? তাই মনের ইচ্ছে তাকে মনেই চেপে রাখতে হয়েছিল।

বিভাসবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে সন্ধ্যা আসে অম্লানের কাছে তার মতামত জানতে।

অম্লান তার সব কথাই মন দিয়ে শুনেছিল। তারপর বলেছিল—তোমার এ বিয়েতে মত দেওয়া উচিত সন্ধ্যা।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা বলে—তাই বলে একটা কানাকে বিয়ে করতে হবে! এর চেয়ে বরং তোমরা আমার হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দাও না কেন। সব ল্যাঠা তোমাদের চুকে যাক। পুরুষজাতটাই এইরকম।

একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে অম্লান বলে—আমায় ভুল বুঝ না সন্ধ্যা। আমি যে কথা বলছি তা মন দিয়ে শোন। তা শুনলে তোমার পক্ষেও যেমন ভাল হবে, আমার পক্ষেও তেমনি ভাল হবে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা মিলনের একটা ব্যবস্থা করতে পারিনি। আর এ বিয়ে হলে হয়তো ভবিষ্যতে একটা মিলনের জায়গা আমরা করতে পারব।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা প্রশ্ন করে—বল কি অম্লান? তা কি করে সম্ভব হবে?

একটু কেশে নিয়ে অম্লান বলে—তুমিই বললে না, ছেলেটা কানা! তা ছাড়া আমি জানি ও বিরাট বড়লোক। ওর টাকায় ছাতা পড়ছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সমস্ত টাকার মালিক হবে তুমি। আর কানা বলে তোমার ওপর নির্ভর করতে সে হবে বাধ্য। তারপরে শুনেছি, লোকটা ভাল গান গায়। গানের জলসার জন্যে প্রায়ই সে দেশবিদেশে যায়। তখন আমাদের মিলনেরও বাধা বোধ হয় হবে না। তা ছাড়া তোমার হাতে টাকা থাকলে আমারও ফিল্মে নামবার সুবিধে হবে।

একবার ফিল্মে নামতে পারলে প্রচুর টাকা আমাদের হাতে আসবে। তখন সুবিধেমত কোথাও চলে গিয়ে আমরা পরস্পরকে বিয়ে করব।

সন্ধ্যা বলে—তা কি করে হবে?

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে অম্লান বলে—তা কেন হবে না। এমনি বিয়েও তো তোমার আমার জাতের জন্যে হবে না। আর আমাদের বিয়ে যখন সেই registry করেই করতে হবে, তখন এতগুলো টাকা তুমি কেন হাতছাড়া করবে! তা ছাড়া ওই কানাটাকে মাঝখানে রাখতে পারলে,—বুঝতে পারলে কিনা, ভবিষ্যতে অনেক সুবিধে হতে পারে।

সন্ধ্যা বি. এ.-ই পাস করেছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাববার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। তা ছাড়া সে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন বিভাস-বাবুর পড়তি অবস্থা। দেনার দায়ে তারই কিছু আগে সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি। তাই সে ছেলেবয়সে শুনেছে অতীত দিনের নানা বড়লোকির কথা। ওই সব ধরনের সুখকর কাহিনী শুনতে শুনতে তার অবচেতন মনেও কখন যে বড়লোক হবার তীব্র বাসনা বাসা বেঁধেছিল তা সে নিজেও জানেনি।

তা ছাড়া দু একজন বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েও সে স্বচক্ষে দেখে এসেছিল তাদের ভোগবিলাসের চিহ্ন। তাই বড়লোক হবার আগ্রহ তার মধ্যে ছিল না যে তা নয়, কিন্তু সেকথা সে মনেও আনতো না অম্লানের কথা ভেবে।

কি জানি কেন, সন্ধ্যা অম্লানকে জ্ঞানী বলেও মনে করতো। সন্ধ্যা ভেবে দেখলো তার একটি মুখের কথায় সুখী হবেন তার বাবা-মা। এমনকি অম্লানও। বোধ হয় তাদেরই সুখী করবার জন্যে সে এই বিয়েতে সম্মত হয়েছিল। আর বস্তার মতন যে লোকটাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কথা হলো, সুযোগ আর সুবিধে মতন তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে রাস্তার ধারে নামিয়ে দিলেই চলবে, সেই কথাই

সে সেদিন ভেবেছিল। তাই সেদিন সে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিল তার আশীর্বাদ আর বিয়েকে। কিন্তু বিয়ের পর সে প্রথম উপলব্ধি করে, নিরঞ্জনকে যতখানি অসহায় মনে করেছিল ততখানি অসহায় সে নয়।

দামী শাড়ি, জড়োয়ার গহনা আর প্রকাণ্ড বাড়ি সন্ধ্যার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আর একটা জিনিস সে শ্বশুরবাড়ি এসে উপলব্ধি করেছিল যে, সেখানে তার শাশুড়ী কেমনভাবে নিরঞ্জনকে উপেক্ষা করেন। নতুন বৌয়ের সামনে উপেক্ষিত হয়েও স্বল্পভাষী নিরঞ্জন হয়েছিল আরও গম্ভীর। যার ফলে সে ধরেই নিয়েছিল যে নিরঞ্জনকে উপেক্ষা করে সকলেই, সেটা সংসারে কিছু বৈচিত্র্য নয়, আর তার প্রধান কারণ তার দৃষ্টিহীনতা।

অম্লানের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হওয়ায় তাকে সে মনে মনে প্রশংসা না করে পারে না।

বিয়ের পর অম্লানও তার ভাই পরিচয়ে তার শ্বশুরবাড়িতেও আসা-যাওয়া শুরু করলো।

অম্লানের সঙ্গে গোপন মিলনে সন্ধ্যা আনন্দও পেত। ভবিষ্যতের আশায় সে হতো উৎফুল্ল।

নিরঞ্জনের প্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝা যেত না। তার অন্তরের কথা হয়তো আমরা কেউই জানতে পারতাম না যদি না ডাঃ ঘোষ সেগুলি লিপিবদ্ধ করতেন। তার থেকেই জানতে পেরেছি নিরঞ্জনের একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল, তা হলো মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে মানুষকে চেনবার ক্ষমতা। আমরা যেমন সাধারণ মানুষের চোখের দিকে চাইলে বুঝতে পারি লোকটি শান্ত কি উত্তেজিত এ ব্যাপারে নিরঞ্জনও ঠিক কণ্ঠস্বর শুনে মানুষটির সম্বন্ধে ধারণা করে নিত।

চোখ যেমন মানুষকে রূপসী মেয়ের দিকে আকর্ষণ করে, ঠিক

তেমনি মিষ্ট শব্দ এই দৃষ্টিহীন লোকদের আকর্ষণ করে। অথচ সন্ধ্যার মিষ্ট কণ্ঠস্বর হওয়া সত্ত্বেও নিরঞ্জন সেখানে অভাব বোধ করেছিল আন্তরিকতার। তাই প্রথম দিন থেকেই সে সন্ধ্যার ওপর কোন আকর্ষণই অনুভব করেনি। তার সমস্ত অন্তর জুড়ে ছিল বাসন্তী। বাসন্তীর ভালবাসার মধ্যে ছিল না ছল, ছিল না কুটিলতা কিন্তু তবু সেই ভালবাসার সূত্র ধরে নিরঞ্জন আর কতদিন তার অপেক্ষা করবে! আজ সে ভালবাসা নিরঞ্জনের কাছে হয়েছে কাহিনী। তাইতো সেদিন তার চিঠি পেয়ে নিরঞ্জন ভুলতে চেষ্টা করেছিল তার সকল দুঃখ। সন্ধ্যাকে সে বিয়ে করেছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গিনী পাবার আশায়। কিন্তু সন্ধ্যার ব্যবহারে সে নিজেকে তার কাছ থেকে দূরেই সরিয়ে রাখতো। সব চেয়ে বেশী তার মনে লেগেছিল, একদিন সামান্য কথার পর সন্ধ্যা যখন তাকে বলেছিল, চোখে যখন জগৎটা দেখতে পাও না তখন জগৎকে বোঝ এমন অহংকার কর কেন?

—অহংকার! একটু থেমে নিরঞ্জন বলেছিল—তা হলে আমার ডিগ্রিগুলো কিছুই নয় বলছ?

একরকম তর্কের খাতিরে সন্ধ্যা বলে—ইউনিভার্সিটিতে আমরাও পড়াশুনা করেছি তো, তাই আমরা জানি শিক্ষকদের মনের অবস্থা। তোমাকে অন্ধ দেখে তাঁরা নিছক দয়াপরবশ হয়ে তোমায় পাস করিয়ে দিয়েছেন। তার ওপর তুমি বড়লোকের ছেলে, কত টাকা খরচ করেছ বল তো?

নিরঞ্জন স্তব্ধ! এতদূর!

সন্ধ্যা তার কাছে চেয়েছিল কানের একটা হীরের দুল।

উত্তরে নিরঞ্জন বলেছিল—মা জানতে পারলে হয়তো মনে মনে দুঃখ পাবে। হয়তো আর একটা নতুন অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে, তার চেয়ে বরং এখন ওটা থাক। এরই সূত্র ধরে তাদের বচসা শুরু হয়েছিল। তা যে এত মর্মান্তিকভাবে শেষ হবে তা সে কল্পনায়ও

আনতে পারেনি। এর ফলে নিরঞ্জনের মুখে পড়লো চাবি। তা ছাড়া অম্লানকেও নিরঞ্জন ভালচোখে দেখতো না। কি যে সে পেয়েছিল তার ব্যবহারের মধ্যে, তা আজ আর আমাদের জানবার কোন উপায়ই নেই। মানমর্যাদার কথা ভেবে বোধ হয় সে চুপ করে ছিল।

কিন্তু ঘটনাটা চরমে পৌঁছুলো বিয়ের ছ মাস পরে।

নিরঞ্জন সন্ধ্যার পর গিয়েছিল একটা গানের আসরে। এমন সে প্রায় যেত। সেদিন শরীরটা তার বিশেষ ভাল ছিল না, বিকেল থেকেই বোধ হয় সামান্য জ্বরও এসেছিল। সকালবেলায় নির্মলা দেবীর সঙ্গে খুঁটিনাটি নিয়ে একটা ছোটখাট কলহও হয়ে গেছে। তারই রেশ তখনও তার মনের মধ্যে থেকে তাকে ব্যথাই দিচ্ছিল।

রাত সাড়ে বারোটার সময় ফিরে এসে সে দেখে মেয়েদের জন্যে যে গাড়িখানা থাকে সেখানা তখন গ্যারেজে তোলা হচ্ছে। একরকম স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সে সোফারকে প্রশ্ন করে—এত রাত্রে কে ফিরলো ?

সোফার হেসে বলে—আজ্ঞে বৌদি, তাঁর ভাইকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন।

—কোন্ ভাই ?

সোফার বলে—আজ্ঞে, অম্লানবাবু—

নিরঞ্জনের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো। সোজা সে চলে গেল সন্ধ্যার শোবার ঘরে। ইতিপূর্বে অম্লানকে নিয়ে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত নির্মলা দেবীও নিরঞ্জনকে করেছিলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানাতে ভোলেননি, সন্ধ্যা বাড়ির গৃহিণী, তাই যা খুশি করবার তার অধিকার আছে। তবে কিনা তিনি মা, থাকতে পারেন না, তাই একথা বললেন।

সন্ধ্যাকে এর পর নিরঞ্জন সাবধান করে দিয়েছিল।

কিন্তু, তার নিষেধ সত্ত্বেও অম্লান এ বাড়িতে যাতায়াত

করে। অন্ধ বলে, মনুষ্যত্বের সামান্য দাবিটুকুও সে কি হারিয়েছে? কোন কথা বলবার কি অধিকার নেই তার?

তবে মিথ্যে এ প্রহসনের অর্থ কি? টাকাকড়ি বিষয় সবই যদি তার হয়, তবে তার সামান্য কথা কেন লোকে শুনবে না? সন্ধ্যা কি মনে করে তাকে? এতখানি সে অসহায়? নাঃ, এর একটা শেষ হওয়া দরকার। কারণ, তার মা যখন সন্দেহ করেছেন, তেমনি তার সঙ্গে বহু লোকই সন্দেহ করেছে। তা ছাড়া বাড়িতে আছে ঝি, চাকর, আমলা, কর্মচারী অনেকেই।

তার অলক্ষ্যে তারা মুখ টিপে হাসবে আর মনে মনে তাকে করুণার পাত্র বলে বিবেচনা করবে। নাঃ, এ অসহ্য!

হয় এ ব্যাপারে কোন একটা যবনিকা পড়বে, নয় কালই সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বহু বহু দূরে। সেখানে হয় একটা গানের স্কুলে কিংবা কোন একটা পড়ার কলেজে সে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে। তারপরে যা হবার হোক। সেখানে কেউ তাকে দেখে হাসবে না, কেউ তাকে করুণার পাত্র বলে বিবেচনা করবে না।

নিরঞ্জন ভাবে তার দাবি কি জগতের কাছে অনেকখানি?

সাধারণ পুরুষের মত, স্ত্রীর কাছ থেকে এতটুকু ভালবাসা বিশ্বাস পাবার অধিকারও তার নেই? তবে মিথ্যে প্রতারণা কেন? নাঃ, যা হবার হোক, আজই এর একটা বিহিত করতেই হবে।

নিরঞ্জনের মস্ত বড় একটা গুণ ছিল যে, রাগ হলে প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজেকে সংযত করতে পারতো। অথচ চেঁচামেচি করে, লোকের সামনে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি সে করতো না। তাই ব্যাপারটা যতটা মর্মান্তিকই হোক না কেন, সে অত্যন্ত সাধারণভাবে চলে যায় সন্ধ্যার ঘরের দিকে।

শান্তভাবে নিরঞ্জন প্রশ্ন করে—সন্ধ্যা, কোথাও গিয়েছিলে কি?

চমকে উঠে সন্ধ্যা বলে—হ্যাঁ, একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

নিরঞ্জন বলে—এত রাত্রে ?

সন্ধ্যা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেছিল নিরঞ্জন তখনও গানের আসর থেকে ফিরে আসেনি। সবার অলক্ষ্যে ঘটনাটা ঘটেছিল বলে সে মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করেছিল। কিন্তু এখন ? কি জবাব দেবে সে ?

উত্তরে সন্ধ্যা বলে—হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল।

—কি দরকার ছিল তোমার জানতে পারি কি ?

সন্ধ্যা বলে—একবার বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

একটু বিদ্রূপের হাসি মুখে ফুটিয়ে নিরঞ্জন বলে—হুঁ, সেই পাড়াতেই গিয়েছিলে বটে, কিন্তু সেখানে যাওনি।

—সেখানে যাইনি আমি ? তুমি কি করে জানলে ?

নিরঞ্জন বলে—অত রেগে যেও না সন্ধ্যা। তাতে ফল ভাল হবে না। কারণ রাত সাড়ে সাতটার সময় যখন আমি বাড়ি থেকে বেরুই, তখনও তোমার বাপের বাড়ি যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কি ঘটনা ঘটলো যে তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে হলো ?

একটু বিরক্তির সঙ্গে সন্ধ্যা জবাব দিল—সব প্রশ্নেরই কি জবাব দিতে হবে নাকি ?

নিরঞ্জন বলে—দেওয়া আর না-দেওয়া তোমার ইচ্ছে। তবে—

একটু কি যেন ভেবে নেয় সে। তারপরে বলে—আমারও জানা দরকার তোমার এই অম্লানদার সঙ্গে কি সম্বন্ধ।

সর্পিণীর মতন একরকম ফোঁস করে উঠে সন্ধ্যা জবাব দেয়—অম্লানদা এসেছিল সে কথা তোমায় বললে কে ?

নিরঞ্জন একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে—সে কথা কাউকে বলবার দরকার করে না, চোখ থাকলেই দেখা যায়।

—চোখ !—সন্ধ্যা যেন নিরঞ্জনকে আঘাত করবার একটা রাস্তা

পেল।—তবুও যদি সে চুটো তোমার থাকতো। তা হলে বুঝতাম নিজে জীবনে চলতে পার। আমাকে ঠকিয়ে—

নিরঞ্জন কথা থামিয়ে দিয়ে বলে—কিসে তোমায় ঠকানো হয়েছে? বিয়ের আগে থেকেই তো তুমি জানতে আমার চোখ নেই।

—তা জানতাম বটে, কিন্তু আমি এটুকু জানতাম না যে তোমার মত একটা মানুষের হাতে আমাকে পড়তে হবে। ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে এনে তোমরা আমায় একটা বড় জেলখানায় বন্দী করেছ। বলতে পার, আমি বাঁচব কি নিয়ে? রাগে, দুঃখে, অভিমানে সন্ধ্যা শেষকালে কাঁদতে লাগলো।—আমি যে তোমার জন্যে কি ত্যাগ করেছি তা তুমি কি বুঝবে! দিনরাত শাশুড়ীর এই গঞ্জনা তার ওপর তোমার এই ইতরের মত ব্যবহার! বিয়ের আগে ভেবেছিলাম আমার ওপর নির্ভরশীল এমনই স্বামী পাব। সকলে আমাকে বুঝিয়ে-ছিল, আমি যেরকম তোমাকে চালাব, তুমি সেরকমই চলবে। আজ দেখছি—বলে সন্ধ্যা একটু চুপ করে যায়।

নিরঞ্জন সাগ্রহে বলে—কি দেখছো?

সন্ধ্যা বলে—নিজের মায়ের সঙ্গে যে ছেলে মামলা করে তার কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারি আমি!

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে নিরঞ্জন বলে—অনেক কথাই দেখছি তুমি জেনে ফেলেছ। এর পরে আর কিছু বলবার আর আমার নেই। বুঝতেই তো পেরেছ আমাকে চালানো চলবে না। তা ছাড়া, অন্ধ ইতর লোকটার সঙ্গে নাইবা রইলে। তাতে তুমিও সুখী হবে না আমিও সুখ পাব না। তুমি তো নিজেই জেনেছ আমি অতি সাংঘাতিক লোক! নিজের মায়ের সঙ্গেও মামলা করেছি, এবং তাঁকে হারিয়ে দিয়ে এ বাড়ি অধিকার করেছি। সুতরাং, আমার এ বাড়িতে থেকে অম্লানবাবুর সঙ্গে গোপনে প্রেম করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কে জানে প্রয়োজন হলে তোমার সঙ্গেই হয়তো কোন্‌দিন মামলা

বাধিয়ে বসবো। সব চেয়ে ভাল, তুমি তোমার বাপের বাড়িতে ফিরে যাও, মাসে মাসে আমার লোক গিয়ে তোমায় টাকা দিয়ে আসবে। তাতে হয়তো তুমিও সুখী হবে আর আমিও সুখী না হলেও শান্তি পাব। তোমাকেও বড় জেলখানায় আর বন্ধ হয়ে থাকতে হবে না।

কথাগুলো শেষ করে একরকম দ্রুতগতিতেই নিরঞ্জন সেখান থেকে চলে গেল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সে রাত্রে সে আর কিছু খেলো না। লোকজন যারা নিরঞ্জনের খাবার নিয়ে বসে থাকে, চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে তারাও আর এগুতে সাহস করলো না।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়িয়ে যাবে তা সন্ধ্যা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বিয়ে তাদের আজ ছ মাস হয়েছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই! কেউ কাউকে ইতিমধ্যে বোঝবারও চেষ্টা করেনি। নিরঞ্জনের সুন্দর মুখের দিকে সন্ধ্যা যখনই তাকাতো, তখনই সে সেখানে দেখতে পেত কিসের যেন একটা অভাব। সন্ধ্যার মত মেয়েরা যারা ভেতরটা দেখতে পায় না, কেবল বাইরেটা দেখেই মানুষকে বিচার করে, তারা সরল হলেও, আত্মাভিমান তাদের থাকে বড্ড বেশী। তা ছাড়া এই অভিমানের কারণ খুঁজতে গিয়ে তারা বাইরের কারণটাকেই সব চাইতে বড় করে ধরে।

এই ধরনের মেয়েরা চোখের চটুলতা না পেলে মনে করে জীবনে বুঝি অনেকখানি পাওয়া গেল না। আর নিজের ভাগ্যকে করে দোষারোপ, কি পেয়েছে কি পাওয়া উচিত তাদের, তার হিসাব তারা করে না, তারা হিসাব করে কি পায়নি।

দিনরাত কেবল সেই হিসাব মেলাতে গিয়ে তারা দেখে তাদের ভাগ্যে পড়েছে শূন্য। আর এই শূন্য স্থানটাকেই তারা আপ্রাণ ভরাবার চেষ্টা করে। আর সেই শূন্যতা ভরাতে গিয়ে তারা পরিমাপকে আরও দেয় বাড়িয়ে। জগতের এই হলো নিয়ম।

সুখ আর দুঃখ নদীর জোয়ার-ভাটার মতন মানুষের মনের ওপর যে খেলা করছে এ তারা বিশ্বাস করে না, করতেও চায় না। বাইরের মানুষকে ধরে তারা তাদের সুখ-দুঃখের বিচার করে। এমনি ভাগ্যের পরিহাস। তার ওপর সন্ধ্যার মত মেয়ে যে নিজের ভালমন্দ বোঝে না, অম্লানের দৃষ্টিতেই যারা পৃথিবীকে দেখে, মানুষ চেনবার চেষ্টা করে, তাদের জীবনে যে এমন অঘটন ঘটবে তাতে আর বৈচিত্র্য কোথায় ?

নিরঞ্জনকে কোন দিনই সে ভালবাসেনি, বাসতে চেষ্টাও করেনি। তার ওপর এ বাড়িতে এসে অবধি নিরঞ্জনের মা আর বোনের কাছ থেকে তার বিরুদ্ধে নানা কথা সে শুনেছে। তার ওপর অম্লানের প্রলোভন ছিল তার কাছে সব চেয়ে বেশী।

নিরঞ্জন সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যা প্রথমটা ভাবতে চেষ্টা করলো কি ঘটেছিল। তার পরমুহূর্তেই সে চিন্তা করে, নিরঞ্জনের ও ধরনের কথা বলবার অধিকার আছে কিনা।

সে একজন বি. এ.-পাস শিক্ষিতা মেয়ে। কিছু না হোক ছাত্রী পড়িয়েও তার জীবন কাটাতে সে পারে। এ অপমান সে কখনও সহ্য করবে না। তা ছাড়া নিরঞ্জনদের মত জমিদারদের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। তার পূর্বপুরুষ সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল বলে তার এই অহংকার। সে অহংকার আর যে কেউ সহ্য করুক, সন্ধ্যা পারবে না। এত অপমানের পরও এ বাড়িতে থাকলে ভবিষ্যতে তাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হতে পারে। তা ছাড়া ওই অন্ধ লোকটার দাসত্ব সে জীবনে করতে পারবে না। তার প্রভুত্ব অসহ্য !

এই ধরনের এলোমেলো চিন্তা করতে করতে সন্ধ্যা গিয়ে লুটিয়ে পড়লো তার বিছানায়। তারপরে বালিশটা বুকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সারারাত সে ঘুমুতে পারে না, প্রতীক্ষা করে সকালের। কখন ভোর হবে !

সকাল হলো। বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। উত্তেজনা তখনও কিছুমাত্র কমেনি। বিশ্রামের অভাবে সমস্ত শরীরে শিরা-উপশিরাগুলো বেদনায় টনটন করে তাদের কাজে অনিচ্ছা জানালো। মাথার ভেতরটাও যেন কেমন করছে। তবু বিশ্রাম নেবার তার সময় নেই। এ বাড়ি ছেড়ে তাকে যেতেই হবে। অম্লান তাকে আশ্রয় দেয়, ভাল; নইলে তার উপায় তাকে নিজেই করে নিতে হবে। বাবা হয়তো একটু রাগ করবেন, তা করুন, তাতে কি যায় আসে। বাবার জন্যে তো সারা জীবনটা সে আর বলি দিতে পারে না। আর সে তো সাধ্যমত তার বাবাকে সাহায্য করেছে। তাদের বসতবাড়িখানাও রক্ষা পেয়েছে। তবে আর কেন? সে এ খেলা আর খেলবে না। তাকে এবার বাঁচতে হবে। এই উন্মুক্ত পৃথিবীতে তারও একটা নিজস্ব স্থান আছে।

নিরঞ্জন প্রথমটা ভেবেছিল, সন্ধ্যা রাগ করে চলে গেলেও রাগ পড়লে আবার সে ফিরে আসবে। কিন্তু সে জানতো না যে জিদ মাঝে মাঝে মানুষকে পাগল করে তোলে আর তাতেই মাঝে মাঝে সে এমন কাজ করে বসে যাতে ভবিষ্যতে তাকে সুস্থমস্তিষ্ক বলে ভাবতেও সন্দেহ হয়। তাই নিরঞ্জনের লোক যখন সন্ধ্যাকে নিয়ে আসতে গেল, তখন তাকে সদর্পেই সে জানিয়ে দিল, সে আর ও বাড়িতে যাবে না।

নিরঞ্জন রায়ের কেনা দাসী বাঁদী সে নয় যে সে তার হুকুম তামিল করতে বাধ্য।

অপরদিকে মা-বাবার কথা কিছুই সন্ধ্যা কানে তুললো না। পাড়ার কাছে একটা মেয়ে-স্কুলে সে নিল চাকরি। কেবল অম্লান তাকে বললো—তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। তার কারণ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল সন্ধ্যার গলায় দামী হারটার ওপর। দাম তার যতই

কম হোক, হাজার পঁচিশ টাকায় ওটাকে বিক্রি করা যাবে। আর এই বিক্রির পর তার ফিল্ম তৈরি করার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে সে। তাই নতুন করে তাকে আবার প্রেম নিবেদন করলো।

মন ভিজতেও দেরি হলো না। রায়পরিবারের হীরের হার এসে পড়লো অম্লানের হাতে। তারপর সেটাকে কাজে লাগাতে আর কতক্ষণ।

মাস দুয়েক না যেতেই সমস্ত খবরের কাগজে এবং প্রাচীরপত্রে দেখা গেল নবাগতা স্নিগ্ধা দেবীর ছবি। কেবল আমার বড়দা আর কমলদা বিস্মিত হয়ে গিয়ে নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই নবাগতা স্নিগ্ধা দেবী আর কেউ নয়, রায়বাড়িরই কুলবধূ সন্ধ্যা।

খবরটা শুনে নিরঞ্জন খুব বিস্মিত হয়নি। কমলদাকে সে কেবল বলেছিল, সন্ধ্যার পরিণাম যে এমন হবে তা আমি আগেই জানতাম। মানুষ হয়েও সে মানুষকে ভালবাসতে শেখেনি, সে জীবনকে মনে করেছিল কেবল চপলতা। মূর্খের মত সে জানে না, এ চপলতা একদিন শেষ হবেই। আর সেদিন—তার বাঁচবার জন্যে বুঝি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বধূ হয়েও বধূর মহীয়সী জীবনকে সে ভালবাসেনি, সে ভালবেসেছিল উচ্ছৃঙ্খলতাকে। তাই সে এঁটো পাতার মত উড়ে গেল ঝড়ের সঙ্গে। কিন্তু ঝড় যেদিন থামবে, সেদিন যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা সে নিজেও জানে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন আরও বলেছিল—বলতে পার কমল, পূর্বজীবনে কি অপরাধ করেছি যার জন্যে এ জীবনে এতটুকু ভালবাসা চেয়েও পেলাম না? মা ভালবাসলেন না, উপরন্তু আমার মুখে এমন কালি মাখিয়ে দিলেন যার জন্যে আজ মাথা তুলে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতেও আমি ভয় পাই। অথচ ভগবান জানেন আমি কি আমার মাকে মাধুরীর চেয়ে কম ভালবাসতাম? কিন্তু—

নিরঞ্জন আর কথা বলতে পারে না। কমলদা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে

বলেন—সবই ভাগ্য ভাই! নইলে তোমার মত প্রতিভাবান শিল্পীরও এমনটি হবে কেন! চোখ থেকেও আমরা যা করতে না পারি, চোখ না থেকেও তুমি তা পারো।

নিরঞ্জন বলে—ব্যস, ওই পর্যন্ত! 'পারো পারো' শুনতে শুনতে কান যে পচে গেল! কিন্তু পেরে লাভ কি হলো? মা ছেলেকে ভালবাসলো না, বোন ভাইকে ভালবাসলো না, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়লো, আর বাসন্তী! সেও বোধ হয়, আমি দেখতে পাই না বলে আমাকে ঘৃণা করে। তার আর কি অপরাধ!

কমলদা বলেন—না, না, সে তোমায় ঘৃণা করে না।

নিরঞ্জন বলে—কিসে বুঝলে তা? ঘৃণা যদি না করতো তবে কি সে দূরে থাকতে পারতো? যদি সে আমাকে এতটুকু ভালবাসতো তা হলে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আমার সুখদুঃখ সে সমানভাবে ভাগ করে নিত। কমল, আমি জীবনপথে বড় অসহায়, বড় একা। ওপর থেকে দেখলে আমায় মনে হয় আমি বড় সুখী। নাম যশের শেষ নেই। সাতটা কোলিয়ারির মালিক। জমিদার নিরঞ্জন রায় ষোল আনার বদলে বিশ আনা সুখী—এই কথাই লোকে জানে। কিন্তু তারা কি জানে যে, সে সুখের দু আনাও যদি আমি পেতাম তা হলে আমি....

খানিকটা চুপ করে থেকে সে নিজের মনেই বলে—খুব বেশী কি চাহিদা ছিল আমার? একটি ছোট্ট সংসার, কল্যাণময়ী হাস্যমুখী একটি স্ত্রী আর একটা ছোট্ট ছেলে, রায়বংশের উত্তরাধিকারী—এদের পেলে তো আমি নিজের জীবনের বেহালার সুর বসন্তরাগে বাঁধতে পারতাম। আমার জীবনের সুর—সবটাই কানাড়া আর বেহাগ। জানি না বাকী জীবনটা কেমন করে সে সুর বাজাবো! Believe me Kamal, I am fed up.

কমলদা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে নিরঞ্জনের গায়ে হাত

রেখে বলেন—এ রকম কথা তোমার কাছ থেকে শুনব তা আশা করিনি। তুমি জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান, কিন্তু একি নিরঞ্জন, তোমার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—ডাক্তার দেখাওনি? রেস্ট নাও তুমি!

—কমল, তুমি আজ আমার গায়ে হাত দিলে বলে বুঝতে পারলে, কিন্তু আমার মনের জ্বর কি করে সারবে ভাই? তার ডাক্তারই বা কোথায়? আর বেঁচে থেকে লাভ কি? সবই তো পেলাম এ জীবনে! বাঁচলে তো কেবল জ্বলতেই হবে। আমাকে অব্যাহতি দাও ভাই!

কিন্তু কমলদা নিরঞ্জনের কোন কথাই শোনেননি সেই সন্ধ্যাবেলায়। জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, নিজেই তাদের পরিবারের ডাক্তার চৌধুরীকে খবর দিয়েছিলেন। ডাক্তার চৌধুরী এসে নিরঞ্জনকে ভাল করে পরীক্ষা করে আমার বড়দা আর কমলদাকে বলেছিলেন—কেস সুবিধার নয়, কেসটা যতদূর মনে হচ্ছে টাইফয়েডে দাঁড়াবে। এখন চাই সেবা আর শুশ্রূষা, কিন্তু বাড়িতে তেমন সেবা করবার লোক কোথায়! তাই বড়দা টেলিফোন করে খবর দিয়েছিলেন 'নার্সেস ইউনিয়ানে', সেবা করার লোকের জন্য।

কমলদাও প্রাণপণ চেষ্টায় খুঁজে বেড়িয়েছিলেন বাসন্তীকে, কিন্তু এই বিশাল কোলকাতায় তাকে খুঁজে পাবেন কোথায়? কেবল ঘোরা আর পরিশ্রমই সার হলো তাঁর।

এমনি সময় নিরঞ্জনের ঘটলো আর এক বিপদ।

তখনকার দিনে টাইফয়েড হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে রুগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হতো। কারণ আজকের দিনের মত তখন 'ক্লোরোমাইসিটিন' বার হয়নি।

সেদিন বোধ হয় সকাল থেকেই নিরঞ্জনের জ্বরটা খুবই বেশী ছিল। নার্স অনবরতই মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে ছিল। নিরঞ্জনের মা এক একদিন এক-আধবার এসে মাঝে মাঝে ছেলেকে দেখে যেতেন।

নার্সকে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বিছানার কাছে পর্যন্ত যেতেন না। সারাটা দিনই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিল, কথা কিছুই বলেনি। সন্ধেবেলায় ডাঃ চৌধুরী এসে নিত্যকার মতন তাকে পরীক্ষা করে গেলেন, ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। রাত্রির নার্সকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে দিনের নার্সও ছুটি নিল।

রাত তখন প্রায় এগারোটা বেজে গেছে, হঠাৎ নিরঞ্জন বলে ওঠে—একটু জল!

ফীডিং কাপে করে জল এনে, তার মুখে ধরে নার্স বললো—এই যে জল এনেছি, খেয়ে নিন।

নিরঞ্জন চমকে উঠে প্রশ্ন করে—কে?

উত্তরে দু'ফোঁটা চোখের জল এসে পড়ে নিরঞ্জনের তপ্ত মুখে।

নার্স কোন জবাবই দিতে পারে না। চাদরের তলা থেকে বাঁ হাতটা বার করে এনে, ফীডিং কাপ ধরা নার্সের হাতটা নিরঞ্জন চেপে ধরে। তারপর তার সমস্ত আচ্ছন্নতা দূরে ফেলে দিয়ে সে বলে—কথা বলছো না কেন? তুমি কি বাসন্তী? ও কণ্ঠস্বর তো আমার ভুল হবার নয়। তুমি কে বল, চুপ করে থেক না।

নার্স বলে—নিরু, শান্ত হও, অমন কোরো না, অসুখ বাড়বে তোমার। তোমার যে high temperature রয়েছে। আমাকে তো তুমি চিনতে পেরেছ।

নিরঞ্জনের মুখ থেকে কেবল বিস্মিত সুরে বেরিয়ে আসে—বাসন্তী, তুমি এসেছ? এতদিন পরে? কথাটা বলতে বলতেই সে উত্তেজনায় উঠে বসতে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাসন্তীও বোধ হয় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেনি। প্রণয়ীর স্পর্শে তারও শরীর বোধ হয় কেঁপে গিয়েছিল। হয়তো চোখে জল এসেছিল, তাই বোধ হয় চোখ চেয়েও রোগীকে সে দেখতে পায়নি। নার্সের কাজে তাই হলো অবহেলা। আর

নিরঞ্জন, খাটে উঠে বসতে গিয়ে মাথা ঘুরে সে পড়লো মাটির ওপর। তার পরেই সে হলো অজ্ঞান। একটা পতনের শব্দ শুনে বাসন্তীর সংবিৎ ফিরে এল। এ সে কি করেছে! নিজের হাতে সে নিরঞ্জনকে মারতে বসেছে! বার বার সে নিজেকে ধিক্কার দেয়—কেন সে নিরঞ্জনের অসুখের কথা শুনে থাকতে না পেরে ছুটে এল? নিজেই হাসপাতালের কাজে কেন সে কামাই করলো? সে প্রণয়িনী, না রাক্ষসী!

যাক, ভাববার আর সময় নেই। তখন যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। শব্দ শুনে বাইরে থেকে লোকজন ছুটে এসেছিল। তাদের সাহায্য নিয়ে সে আবার নিরঞ্জনকে শুইয়ে দিল তার বিছানায়। খবর পাঠালো ডাক্তার চৌধুরীকে। আধঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ চৌধুরী এসে পড়লেন। শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছিল?

আমতা আমতা করে বাসন্তী বলে—আইসব্যাগ ধরে বসে থাকতে থাকতে একটু ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ উনি জল চান। আমি জল আনতে গিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় উনি উঠে বসতে গেলেন। তার পরেই—

কথাগুলো আর বাসন্তী শেষ করতে পারে না। ডাঃ চৌধুরী ততক্ষণে নিরঞ্জনকে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছেন। পরীক্ষা শেষ করতে বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে—উনি ভাল আছেন তো? কোনও ক্ষতি হয়নি ওনার?—কথা বলতে গিয়ে অবাধ্য অশ্রুকে সে রোধ করতে পারে না। ডাঃ চৌধুরীর সামনেই তা টপটপ করে ঝরে পড়ে।

বিস্মিত হয়ে ডাঃ চৌধুরী বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর প্রশ্ন করেন—Is he Known to you? সত্যি কথা বল, তুমি কি ওঁকে চেন?

বাসন্তী জবাব দিতে পারে না, মুখ নামিয়ে নেয়। ডাঃ চৌধুরী

আরো বলেন—আজ রাত্রেই তুমি প্রথম এসেছ। কারণ, ওদিকে নাইট সিস্টারদের আমি দেখেছি। ও ক'দিন তুমি আসনি। নিরঞ্জনের মত শান্ত ছেলের চট্ করে উঠে বসার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ! তা ছাড়া, তোমার চোখেও জল দেখছি। সাধারণ কোনও সিস্টারের রোগীর ওপর এতটা আন্তরিকতা আমি দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। সত্যি কথা বল তো মা, আমার অনুমান সত্যি না মিথ্যা! কারণ, এতে আমারও প্রয়োজন আছে। তা নিরঞ্জনের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালই হবে।

একরকম উদ্বিগ্ন হয়েই বাসন্তী বলে—আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

ডাঃ চৌধুরী বলেন—লিভারে একটু লেগেছে মনে হচ্ছে! দেখি, কতদূর কি হয়! এই injectionটা দিলাম। দেখা যাক কি ফল হয়! এইবার তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

একটু ভেবে নিয়ে বাসন্তী বলে—হ্যাঁ, উনি আমার সঙ্গে কলেজে পড়তেন। বন্ধুত্বও হয়েছিল। অবস্থার পাকে পড়ে কলেজ আমি ছেড়ে দিই। এই লাইনে আসতেও বাধ্য হয়েছি। আজ বহুদিন পরে আমার কণ্ঠস্বর শুনে উনি হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অদ্ভুত ওঁর স্মরণশক্তি! আমি তো ভেবেছিলাম, উনি আমাকে চিনতেই পারবেন না। কিন্তু তবুও···কাল থেকে আমি আর আসব না।—কথাটা বলতে গিয়ে বাসন্তী আবার চোখ মোছে।

—আসবে না! তোমাকেই তো এখন বেশী করে এখানে থাকতে হবে। তার কারণ, তোমার অন্তরে তার জন্যে স্নেহ ভালবাসা আছে। তাই তুমিই পারবে তার মনকে ভরিয়ে তুলতে। মনের সঙ্গে দেহের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মন যদি ভাল থাকে, তাতে শরীর ভাল হতে দেরি হয় না। আমরা ডাক্তাররা কি করতে পারি?

গোটাকতক বিলাতী ওষুধ দিয়ে রোগীর দেহটাকে সারাবার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। কিন্তু তার সঙ্গে মন যদি সাহায্য না করে তা হলে সে কি করে সারবে? তাই তোমাকে বলছি, যতদিন নিরঞ্জন না সেরে ওঠে, ততদিন তোমাকে আসতেই হবে। তাকে তোমাকেই সারিয়ে তুলতে হবে। আমি হব তার উপলক্ষ মাত্র। কেমন—রাজী?

বাসন্তী আর ডাঃ চৌধুরীর দিকে চাইতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে থাকে।

খানিকটা নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে সে বলে—আমি এলেই যে নিরঞ্জন ভাল হবে তার প্রমাণ?

—প্রমাণ? প্রমাণ কিছুই নেই, আমার অনুমান মাত্র। তা ছাড়া, এ পৃথিবীতে স্থিরনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। It is pure and simple an experiment. যাক, রাত অনেক হয়ে গেছে, তুমি রোগীর ওপর ভাল করে নজর রাখ, তেমন বুঝলে আমাকে খবর দিও। আচ্ছা, আজ এখন চলি।

বাসন্তী সত্যই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল তাকে সারিয়ে তোলবার জন্য। তেমনটি হয়তো অতিবড় আত্মীয়ও করতে পারে না। নিরঞ্জনের ভালভাবে জ্ঞান না হওয়া অবধি সে রায়বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি। তারপর দিনের বেলায় তার ছুটি হলে, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সে ফিরে আসতো সেখানে দিনের নার্সকে সাহায্য করতে। অবশ্য সাহায্যের প্রয়োজনও খুব যে একটা ছিল তা নয়। বাসন্তীর সঙ্গে দরকার ছাড়া নিরঞ্জন বিশেষ কথা বলতো না। সে রাত্রে হঠাৎ বাসন্তী নিরঞ্জনকে বললো—এখন তো তুমি ভাল আছ। আমি বরং কাল থেকে আর আসব না।

একটু বিস্মিত হয়ে গিয়ে নিরঞ্জন বলে—কেন আসবে না বাসন্তী? তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? তা ছাড়া এসেছই যখন, এ বাড়ি ছেড়ে যাবার তোমার প্রয়োজন? আমি এখনও গায়ে ভাল জোর

পাইনি। এরই মধ্যে তুমি চলে যাবে?—কথাটা বলতে বলতে নিরঞ্জন বাসন্তীর হাতটা চেপে ধরে।

বাসন্তী বলে—আমার যে থাকবার উপায় নেই নিরু! নইলে আমার কি সাধ তোমায় ছেড়ে যেতে? আচ্ছা, ভাল কথা, তোমার এত বড় অসুখ গেল, তোমার স্ত্রীকে তো একদিনও একবার দেখলাম না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিরঞ্জন বলে—সাধ করে অন্ধের সঙ্গে কে জীবন কাটাবে বল? আর তুমি তো তাকে দেখেছ!

বাসন্তী বিস্মিত হয়ে গিয়ে বলে—না, আমি তাকে দেখিনি।

—কেন, ফিল্‌মে স্নিগ্ধা দেবীর ছবি তুমি কি দেখনি কোনদিন? একটু থেমে সে আবার বলে—বাসন্তী, আমি বড় একা, সারিয়ে যখন তুললে তখন আর আমাকে ছেড়ে যেও না। বিশ্বাস কর, কলেজে তোমাকে হারিয়ে অবধি কত খুঁজেছি। কিন্তু তবু আমি তোমার সন্ধান করতে পারিনি। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার এই অনুরোধটুকু কেবল রাখ। আমি আবার বিয়ে করব। তাতে মায়ের যদি আপত্তি থাকে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে দেব, রায়েদের সম্পত্তির এক কপর্দকও আমি নেব না। কলেজে অধ্যাপনা করে আমি যা পাই তার থেকে, আর গানের আসর থেকে যা রোজগার করতে পারব, তাইতে আমাদের সুখে চলে যাবে।

একটু হেসে বাসন্তী বলে—কিসে আর কিসে! তোমার কত মান, কত সম্মান। তুমি বড়লোক। আর আমি সামান্য একটা নার্স! আমার জন্যে তুমি কেন এই দুঃখ বরণ করতে যাবে নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন বলে—সব কিছুর ওপরে মানুষের মন। জান তো, মন যদি সুখী থাকে তা হলে নুন ভাত খেয়েও মানুষের স্বাস্থ্য ফেরে। আর তা যদি না হয়, তা হলে পোলাও-কালিয়া খেলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। একসময়ে তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, সেই ভালবাসার

জোরেতেই আমি একথা বলছি। বল, বল, তুমি আমার কথা রাখবে!—কথাটা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে নিরঞ্জন বিছানায় উঠে বসে। তারপর দু'হাত দিয়ে বাসন্তীকে জড়িয়ে ধরতে চায় নিজের বুকে।

বাসন্তী প্রথমে বাধা দিতে পারেনি। কিন্তু নিরঞ্জনের বুকের উষ্ণ স্পর্শে তার কি যে হলো, তা সেই জানে।—আঃ, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে নিরু—বলে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তারপর শান্তভাবে বলে—তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না, পেলে জানতে আমার পরনে থান কাপড় আছে।

নিরঞ্জন একটু উত্তেজিত হয়ে বলে—তাতে কি বাসন্তী, বিধবার তো এখন যথেষ্ট বিবাহ হয়। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে,—আপত্তি মানে যদি তুমি আমায় না ঘৃণা কর তা হলে, আমি প্রস্তুত তোমায় বিয়ে করতে।

বাসন্তী বলে—আমি তোমায় ঘৃণা করব, একথা তুমি ভাবতে পারলে? হতে পারি আমি গরিব, তাই বলে মন বলে কি আমার কোন পদার্থ নেই? তবে তুমি আমার কথা শোন নিরু, তারপর তুমিই আমাকে বলে দাও আমার কি করা উচিত। তুমি জানতে আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না। কলেজ ছাড়ার কিছুদিন পর আমি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। তাই সংসার একরকম প্রায় অচল হয়ে যেত। তাই নিজে রোজগার করব বলে আমি এই পথে আসি। নার্সিং পাস করি। রোজগারও আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে আমার স্বামী একটি ছেলের জন্ম দিয়ে মারা যান। নইলে আমার দিক্ থেকে তোমাকে বিয়ে করতে কোন আপত্তিই ছিল না। আমার জীবনে খোকাই আমার একমাত্র অবলম্বন।

বাসন্তীর কথাগুলো যেন নিরঞ্জনের পিঠে চাবুক মারলো। বাঁচবার

শেষ আশ্রয়টুকু বুঝি সে হারিয়ে ফেললো। শান্ত হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে সে বললো—নাঃ, আমি তোমায় বলি না আমায় বিয়ে করতে। তবে এইটুকু অনুরোধ, যে ক'দিন না নিজে ভালভাবে চলাফেরা করতে পারি, সে ক'টা দিন তুমি আসা-যাওয়া কর! তবে স্থির বিশ্বাস রেখ, আমি এমন কোন ব্যবহার তোমার সঙ্গে কখনও করব না যা ভবিষ্যতে তোমার ছেলের কাছে তোমায় লজ্জা দেবে। বন্ধুত্বের দাবিতেই আজ এই কথা কেবল বলছি।—কথাগুলি শেষ হলে নিরঞ্জনের বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

আর বাসন্তী? জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কেন যে সেদিন সে বার বার চোখ মুছেছিল তা কেউ জানতে পারেনি। বোধ হয় নিরঞ্জনকে মন থেকে মুছে ফেলতে সে কোনও দিনই পারেনি। প্রেমাস্পদকে এত কাছে পেয়েও সে তাকে ছাড়তে বাধ্য হলো কেবল ভাগ্যের খেলায়। মনে মনে সে কি ভগবানকে অভিশাপ দিয়েছিল? তা কে জানে! অন্তত সে খবর আমার জানা নেই।

কেটে গেছে আরও দীর্ঘ দুটি বছর। নিরঞ্জন ভোলবার চেষ্টা করেছে বাসন্তীকে কিন্তু পারেনি।

আগে ছিল নিরাশার মধ্যে ছোট্ট একটু আশা। যদি বাসন্তীকে কোনদিন পাওয়া যায়! কিন্তু আজ! আর তো কিছুই নেই আশা করবার! সব হিসেবনিকেশ বুঝি ফুরিয়ে গেছে নিরঞ্জনের জীবনে! দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত নিত্য সে তার কলেজে যায়। ছাত্র পড়ায়। আবার ফিরে আসে। গানের আসরেও সে যায়। বেশির ভাগ দিনই গান গায় না, বলে—"গলা খারাপ"।

কমলদা বা আমার বড়দা কোন কিছু বোঝাতে গেলে অন্যমনস্ক

হয়ে থাকে, ভাল করে শোনেও না সে। জিজ্ঞেস করলে বলে—কি হবে টাকাপয়সায় ?

তবে পেটের একটা ব্যথায় প্রায় সে ভোগে। কারণটা অবশ্য কোলকাতার কোন ডাক্তারই ধরতে পারেননি।

সে রাত্রে নিরঞ্জনের ফিরতে একটু রাতই হয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর সে জানতে পারে একজন স্ত্রীলোক তার জন্যে সন্ধে থেকেই অপেক্ষা করছেন।

শরীরটা তার সেদিনও ভাল ছিল না। তবুও ভদ্রতা এড়াতে না পেরে, নিরঞ্জন যায় বাইরের ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

ঘরে ঢোকার পরই ভদ্রমহিলা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে নমস্কার জানান। ঘরে একা বসে ভদ্রমহিলা বোধ হয় অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তাই তাঁর গলার আওয়াজটা শোনালো অত্যন্ত কাঁপা। সেই কাঁপা স্বর শুনে নিরঞ্জন চমকে উঠে বললো—কে, সন্ধ্যা! I mean স্নিগ্ধা দেবী! আপনার আবার কী প্রয়োজন ?

সন্ধ্যা এবারে আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তারপর কান্নার বেগ একটু কমলে বলে ওঠে—আমাকে তুমি রক্ষা কর!

—তোমাকে রক্ষা করব আমি? রক্ষা করবার সামর্থ্যই বা কোথায় ? তা ছাড়া তুমি হয়তো জান, আমি চোখে দেখতে পাই না। এই না দেখতে পাওয়াটা যে কতবড় অপরাধ তা আর কেউ না জানুক, তুমি তো ভালভাবে জান! আমার সঙ্গে জীবন কাটানো একরকম অসম্ভব জেনেই তো তুমি আমায় ছেড়ে গিয়েছিলে সন্ধ্যা!

এ কথার জবাবে সন্ধ্যা কোনও কথাই বলতে পারে না। তারপরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে—তবুও আমি তোমার কাছে এসেছি, কারণ এ বিপদে একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার।

একটু বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ মিশিয়ে নিরঞ্জন বলে—আমি! আমার কাছ থেকে তুমি আশা কর সাহায্য? জান, জান সন্ধ্যা, তুমি কি

করেছ আমার ! আমি হতে পারি অন্ধ ! তবুও আমি মানুষ । সে কথা তোমরা ভুলে যাও । আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয় । ভগবানের দেওয়া অভিশাপই বল আর আশীর্বাদই বল, ভাগ্যকে আমার মেনে নিতে হয়েছে । কিন্তু কর্ণের মতন সারা পৃথিবী জুড়ে আমার সঙ্গে যে এমন শত্রুতা করবে, এমন কথা তো আমি ভাবতে পারিনি। আমার মা, তুমি, আমার বোন আমার মুখে যে চুন-কালি মাখিয়েছ, তার দাগ বোধ হয় সারা জীবন ধরে ধুলেও উঠবে না । তবুও এসেছ যখন, আমি তোমার কথা শুনব । বল কি বলবে ।

সন্ধ্যা বলে—দরজাটা বন্ধ করে দাও ।

নিরঞ্জন বলে—তোমার আমার মধ্যে আর সে সম্বন্ধ নেই । যদি কিছু বলবার থাকে, তা দরজা খুলে রেখেই আমাকে বল। গোপনীয় যদি হয়, বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে বল, যাতে কেউ এদিকে এলে তুমি সাবধান হতে পার । জানই তো—আমি আবার দেখতে পাই না ।

সন্ধ্যা বলে—কাটা ঘায়ে অমন করে আর নুনের ছিটে দিও না । তবুও তোমাকে শুনতে হবে আমার কথা । বিশ্বাস কর, কালি তোমার মুখে আমি দিইনি । বরং আমিই তা সর্ব অঙ্গে মেখেছি ! নইলে তোমার মত চরিত্রের স্বামীকেও আমি অবহেলা করেছি !

নিরঞ্জন বলে—থাক সে সব কথা, কি বলতে এসেছ এখন তাই বল । আমার পেটের ব্যথাটা আবার সামান্য সামান্য শুরু হচ্ছে ।

সন্ধ্যা বলে—তুমি বোধ হয় জান, অম্লানের সঙ্গে আমি দু'তিনটে ছবিতে কাজ করেছি । করতে গিয়ে এ কাজের যা সেলামী তাই আমাকে দিতে হলো । ফলে আজ আমি একটা অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হতে চলেছি । ওদের পায়ে ধরে কেঁদেছি, যদি ওরা আমায় রক্ষা করে । কিন্তু তা ওরা করেনি । শুধু তাই নয়, আমি ছবিতে কাজ করেছি বলে বাবাও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন । ওপাড়াতেই একটা

ঘর ভাড়া করে আমি আলাদা থাকি। দুটো ছবি পর পর না চলায় আমার ছবির কাজও বন্ধ। আর ছবিতে কাজ করেছি বলে কোনও স্কুলে বা কোথাও আমার স্থান নেই। এখন তুমি না দেখলে আমার উপায়? খাবার অভাবে আর পরিচয়ের অভাবে আমাকে আর আমার সন্তানকে হয়তো নেমে যেতে হবে কোন্ গহন অন্ধকারে। নইলে আমার শেষ ভরসা তুমি। আমি জানি তোমার শরীরে দয়া আছে, মায়া আছে। আমি মহা অপরাধী তোমার কাছে। তবুও আমি এসেছি এতটুকু দয়ার আশায়।

নিরঞ্জন বলে—ভাল! নিজের বোঝা যে বইতে পারে না তার কাছে তুমি এসেছ আর একটা বোঝা দিতে! দেখ, তোমরা ভগবান বিশ্বাস কর না, কিন্তু আমি করি। জীবনের সব ঘটনাকেই তাঁর দেওয়া বলে মনে করি। তার ফলে আজও হয়তো আমি দাঁড়িয়ে আছি। নিজের স্বার্থের জন্যে কখনও নিজেকে গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ করতে চাইনি। এইটাই কি আমার জীবনের বড় অপরাধ সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা কোনও কথা না বলে নীরবে কাঁদতে থাকে।

খানিকটা চুপ করে থেকে নিরঞ্জন বললো—আমিও যে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম, সেই মায়ের গর্ভেই তো মাধুরী জন্মেছে। অথচ ছেলেবয়স থেকেই তিনি করলেন মাতৃ-স্নেহের তারতম্য।

কিন্তু বাবা আমাকে ভালবেসেছিলেন। বোধ হয় তাঁর ভালবাসার জোরেই আমি মানুষ হতে পেরেছি।

আর মা, নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে গেলেন। জানি না কতদিন আর তিনি প্রকৃতিস্থ থাকবেন।

যাক সে সব কথা।

নিজের সজল চোখ দুটো নিরঞ্জন একবার মুছে নেয়। তারপরে বলে—তোমার এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি সন্ধ্যা, বল।

সন্ধ্যা কাঁদতে কাঁদতে বলে—অনেক দীনদুঃখীকে তুমি সাহায্য

করেছ। অনেকে তোমার দয়ায় মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। তুমি আমাকেও বাঁচবার অধিকার দাও! লজ্জার হাত থেকে রক্ষা কর!

—রক্ষা!

—হ্যাঁ, রক্ষাই! তুমি না বাঁচালে আমাকে হয়তো মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে করলেও তো মরণ আসে না!

—সত্যি কথা সন্ধ্যা, মরতে চাইলেও বুঝি মরতে পারা যায় না। অথচ যাক—। কই বললে না তো, আমি কি করতে পারি তোমার। তাড়াতাড়ি শেষ কর কথাটা, পেটের ব্যথাটা আবার বাড়ছে। এক্ষুনি হয়তো ডাঃ চৌধুরীকে আবার খবর দিতে হবে।

সন্ধ্যা কি যেন ভেবে নেয়, তারপরে বলে—তুমি আমার এই সন্তানকে স্বীকার কর। আমাকে স্ত্রী বলে,—কথাটা সন্ধ্যা আর শেষ করতে পারে না।

একটু উত্তেজিত হয়ে নিরঞ্জন বলে—এ কথার অর্থ বোঝ সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা বলে—বুঝি, আমি সব বুঝি। ভেব না তুমি, আমি পাগল হয়ে গেছি। তবুও এ ছাড়া বাঁচবার আর আমার অন্য উপায় নেই।

নিরঞ্জন খানিকটা কি যেন ভেবে নেয়, তারপরে শান্ত-কণ্ঠে বলে—আমার পক্ষের অসুবিধা তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি। তোমার সন্তানকে যদি আমি স্বীকার করি সে হবে রায়বংশের উত্তরাধিকারী। ছেলে যদি হয় তা হলে রায়বংশকে জল দেবার অধিকার তার জন্মাবে। আর মেয়ে যদি হয় এ সম্পত্তি পাবার অধিকার তার থাকবে। ও দুটোর কোনটাই দেবার অধিকার আমার নেই। তবে আমার কাছে যখন এসেছ সাহায্য ভিক্ষা করতে, আমার সাধ্যমত সাহায্য আমি তোমায় করব। তোমার সন্তানকে আমি স্বীকার করব। তবে উইল করে এর ওপর তার অধিকার দুটো আমাকে বন্ধ করতে হবে। রাজী যদি থাক, পরে আমায় জানিয়ো। আমি আর বসতে পারছি না, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।

সোফা থেকে উঠে পড়ে নিরঞ্জন বলে—আজ এস—টাকার দরকার আছে কি ?

সন্ধ্যা কথার জবাব দেয় না।

পকেট থেকে দুশো টাকা বার করে নিরঞ্জন বলে—দুশো টাকা আপাতত নিয়ে যাও। পরে একটা ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে। আচ্ছা এখন এস।—নিরঞ্জন চলে যায় বাড়ির মধ্যে।

টাকাটা হাতের মধ্যে নিয়ে সন্ধ্যাও বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। মনে মনে ভাবতে থাকে নিরঞ্জন মানুষ না দেবতা।

পেটের ব্যথাটা নিরঞ্জনের কিছুতে কমে না। ডাক্তারেরাও বিশেষ কিছু ধরতে পারেন না, সে কথা আগেই বলেছি।

হালে পানি না পেয়ে ডাক্তারেরা তাকে সাইকো-অ্যানালিটিক ট্রিটমেণ্ট করতে বলেন। তাই সেদিন সে ডাঃ ঘোষের চেম্বারে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে সে সুফল কিছু পেল না।

আমার কৌতূহলও তাকে দেখে সেদিন বেড়েছিল। পেটের ব্যথা কমা দূরে থাক, বরং বাড়তেই থাকলো।

এই রকম সময়ে একদিন আমার বড়দার অনুরোধে আমি যাই নিরঞ্জনের বাড়ি।

নিরঞ্জন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তার কারণ সে উইল করতে চায়। উইলের এক্সিকিউটার হিসাবে আমাকে আর বড়দাকে সে রাখতে চায়। তার শরীরের অবস্থা দেখে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। উইলও হয়ে গেল।

ডাঃ ঘোষের চেম্বারে নিরঞ্জন যাওয়া বন্ধ করার পর, আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যই আমি একদিন সোজা গিয়ে দেখা করি ডাঃ ঘোষের সঙ্গে। সব কথা জানিয়ে আমি চেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে

নিরঞ্জনের কেস ডায়েরীটা। তখন অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিরঞ্জনের জীবনে বাসন্তী কে তা জানবার জন্য।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। নিরঞ্জনের বিয়ের পরই আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তাই বাকী জীবনের কাহিনী তাঁর ছিল অজানা। আর বোধ হয় জানলেও তাঁর মত দুঃখ পৃথিবীতে তখন আর কেউ পেত না। এ একরকম ভালই হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

নিরঞ্জনের চল্লিশটা বছরের জীবনের মধ্যে আরও কি যে ঘটেছিল সে ইতিহাস আমার জানা নেই।

তবে আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম তার মৃত্যুর দিনে। দু'মাস আগে থেকে সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে কোলকাতার একটা বিখ্যাত হাসপাতালে। কেবিনে কখনও তার জ্ঞান থাকতো কখনও থাকতো না।

নিরঞ্জনের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিশেষ কেউ যাতায়াত করতো না। তবে আমার কি জানি কি হয়েছিল, রোজ অফিসের পর আমি তার কেবিনে যেতাম। চুপচাপ চেয়ে থাকতাম তার দিকে। আর প্রায়ই মনে হতো, কতবড় একটা প্রতিভার অবসান হয়ে যাচ্ছে!

নিরঞ্জনের মা আসতেন না। আসবার অবস্থায়ও তিনি ছিলেন না। কারণ তখন তিনি সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। নিজের মনে কখনও হাসেন কখনও বা কাঁদেন।

যাক সে সব কথা।

একদিন নিরঞ্জনের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল।

কিন্তু নিরঞ্জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল না সব কিছু।

যে মেয়েটি নিরঞ্জনের সেবার কাজে রত ছিল সে গেল স্টাফ সিস্টারের কাছ থেকে সাদা কাপড় এনে নিরঞ্জনের দেহ ঢেকে দেবার জন্যে। স্টাফ সিস্টার তাকে সে কাপড় দিলেন না। নিজেই এলেন সাদা চাদর হাতে নিয়ে নিরঞ্জনকে ঢেকে দিতে।

আমি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। বড়দা গিয়েছিলেন ওর আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে।

চাদরটা ঢাকতে এক মিনিটের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়ে দেখলাম কেবিনের দরজা বন্ধ রয়েছে পাঁচ মিনিটের ওপর!

একরকম দারুণ কৌতূহলেই আমি এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। ঘরের ভেতরে একটা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

দরজা ঠেলতে ইচ্ছা হলো না। অথচ ঘরের মধ্যে কে যে কাঁদছে তা জানবার আগ্রহও হলো দারুণ। তাই দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম।

বিস্মিত হয়ে গিয়ে আমি ঘরের মধ্যে দেখলাম স্টাফ সিস্টার নিরঞ্জনের মুখের ওপর মুখ রেখে অঝোরে কেঁদে চলেছেন।

মনে প্রশ্ন জাগলো—ইনি কে? কেনই বা নিরঞ্জনের জন্যে তিনি অমন করে কাঁদছেন? আর এ কান্না সহজে তো মানুষের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে না। ইনি বাসন্তী দেবী নন তো?

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। তখন তাঁর চোখ মুখের অবস্থা দেখে কোন প্রশ্নই আর তাঁকে করতে ইচ্ছে হয় না।

কাহিনী হয়তো এইখানেই শেষ হয়ে যেত। শেষ করতে পারলাম না কেবল আমি নিরঞ্জনের উইলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম বলে। তার ইচ্ছামত সব ব্যবস্থাই করা হলো। সন্ধ্যাকেও নিরঞ্জন কোলকাতা শহরে একখানা বাড়ি দিয়ে গিয়েছে। আর একখানা বাড়ি সে দিয়েছিল বাসন্তীর ছেলেকে। তাই আমাকে বাসন্তীর খোঁজ করতে হলো।

সন্দেহমত হাসপাতালে খোঁজ করতে স্টাফ সিস্টারের ঠিকানা পাওয়া গেল। ঠিকানা ধরে গেলাম তাঁর বাড়িতে। বসবার ঘরে

চাকর আমাকে বসিয়ে রেখে বাসন্তীকে গেল খবর দিতে। ঘরেতে আসতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি পরিষ্কার বললেন—নিরঞ্জন রায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে আপনাকে দেখেছি না?

আমি বলি—হ্যাঁ, ভুল করেননি।

শান্তকণ্ঠে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি প্রয়োজন?

আমি বলি—প্রয়োজন ঠিক আপনাকে নয়, আপনার ছেলেকে। কারণ নিরঞ্জন রায়ের উইলে আপনার ছেলেকে তিনি একখানা বাড়ি দিয়ে গেছেন।

—আমার ছেলেকে?—বিস্মিত হয়ে তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন।

আমি বলি—হ্যাঁ।

খানিকটা কি যেন ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—আমার তো কোন ছেলে নেই! আর লৌকিক বিয়েও তো আমার হয়নি!

ডাঃ ঘোষের কাছে নিরঞ্জন বাসন্তীর ঘটনাটা বলেছিল। তাই সে ঘটনা আমার অবিদিত ছিল না। তাই আমি বলি—অথচ আপনিই তো তাঁকে বলেছিলেন আপনি বিধবা, কেবল মাত্র ছেলের মুখ চেয়ে আপনি তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন না।

সচকিত হয়ে গিয়ে বাসন্তী দেবী বলেন—একথা আপনি জানলেন কি করে?

আমার মুখ থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। জানতে পারি, আপনি তার কে?

আমি আমার সমস্ত পরিচয়ও তাঁকে জানালাম। উত্তরে তিনি কেবল বললেন—সত্যিই সেদিন আমি বিধবা ছিলাম না, মিথ্যা কথা বলেছিলাম তাকে। কিন্তু আজ, আপনি বিশ্বাস করুন, তার ফলে

আজ আমি বিধবা। পৃথিবীতে আপনার বলে ভাববার কেউ বুঝি আমার নেই!

আমি বলি—তবে সেদিন অমন করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন কেন জানতে পারি কি?

তিনি বলেন—সে কাহিনী বলতে গেলে আমাকে শুরু করতে হয় আর এক ইতিহাস, যে ইতিহাস আপনার জানা আছে কিনা জানি না। সে ইতিহাস কি আজই শুনবেন?

কৌতূহল আমার বাড়তে থাকে। তাই বলি—আপনার আপত্তি না থাকলে এখনই শুনতে পারি।

তিনি বলেন—তবে একটু বসুন, এক কাপ চা করবার কথা বলি। —এই কথা বলে তিনি আবার চলে যান বাড়ির ভিতরে।

তারপরে ফিরে এসে বলেন—আজ রবিবার ছুটির দিন। আপনি যখন নিরঞ্জনের স্নেহের পাত্র, তখন আমারও স্নেহের পাত্র। আপনার নামটা কি জানতে পারি ভাই?

আমি বলি—নিশ্চয়ই পারেন, আমার নাম সুরেশ।

বাসন্তী দেবী বলেন—সুরেশ! যাক ভালই হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। কথা বলতে বলতে যদি বেলা হয়ে যায়, তা হলে দিদির বাড়িতে খেতে আপত্তি নেই তো?

আমি বলি—তার প্রয়োজন হবে না. দিদি, আমি বাড়ি গিয়েই খাব।

একটু জিদের বশেই তিনি বলেন—কেন, খেতে আপত্তি আছে কিছু?

আমি বলি—না।

—তা হলে, আপনাকে থাকতেই হবে। আমার এ কাহিনী শুনতেই হবে। নিরঞ্জনও আমাকে ভুল বুঝে গেল। কিন্তু এটুকু সে বোঝেনি, অবশ্য বুঝতে আমি তাকে দিইনি, কতখানি দুঃখ আমি

নিজে পেয়েছি। সে আমাকে ভুল বুঝুক তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আপনি—যাকগে, কি বার বার আপনি বলছি, তুমি আমার ছোট ভাই। আমার নিজের ভাই বেঁচে থাকলে তোমারই বয়সী হতো। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না!

আমি বলি—দিদি, এ দুঃখ আপনি কেন নিলেন? নেবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনি তো জানেন না, যখন আপনার চিঠি নিরঞ্জনের হাতে গিয়ে পড়েছিল সে চিঠি আমিই পড়ে শুনিয়েছিলাম। অতখানি দুঃখ আর অশান্তির মধ্যে আপনার ওই চিঠিখানা তাকে কতখানি শান্তি দিতে পেরেছিল। এসব কথা আমি জানি, কারণ তখন আমি সব সময় তার কাছে থাকতাম। তাকে পড়ে শোনাতাম।

আমার কথাগুলো বোধ হয় বাসন্তীদি গিলছিলেন। কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সবই আমার ভাগ্য!

আমি বলি—কই, কারণটা এখনও তো বললেন না। আপনাকে যদি সে পাশে পেত তা হলে বোধ হয় তার এভাবে অপমৃত্যু হতো না।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন ঘরে টাঙানো নিরঞ্জনের একটা ছবির দিকে।

ছবিটা বোধ হয় নিরঞ্জনের বি. এ. কিংবা এম. এ. পাস করবার পর তোলা। কারণ তাতে দেখা যাচ্ছে নিরঞ্জন পরে আছে কনভো-কেশনের গাউন।

তারপর সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন—হ্যাঁ কি বলছিলাম? কেন আমি এই ছলনা নিরঞ্জনের সঙ্গে করেছি, তাই না? তিল তিল করে আমি তাকে নিজের হাতে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়েছি—কেমন?

আমি বলি—আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে, আমিও ভাবতাম সেই কথাই। তবে এখন আর সে কথা মনে হচ্ছে না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সত্যিই তাকে ভালবাসতেন। কিন্তু—

একটু হেসেই বাসন্তীদি বলেন—সব গোল বেধেছে ওই 'কিন্তু'তে। কিন্তু আমার কাহিনী শোনবার পর তোমার আর সে কথা মনে হবে না। তার আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। নয়নতারার কথা কিছু তুমি শুনেছো?

আমি বলি—কোন্ নয়নতারা? সেই বিখ্যাত বাঈজী, যিনি সন্ন্যাসী শংকর রায়ের কাছে গিয়েছিলেন গান শিখতে?

একটু উৎসাহিত হয়েই বাসন্তীদি বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমি বলি—বাবার ডায়েরীতে তাঁর কথা আমি পড়েছি। তা ছাড়া পরে ভবেশ রায়ও যে রত্না বাঈএর প্রেমে পড়েছিলেন, সে কথাও জেনেছি। কিন্তু তারপর তাঁদের কোনও কথা আর বাবার ডায়েরীতে পাইনি।

বাসন্তীদি বলেন—এর পরের কাহিনী আমার মুখ থেকেই তোমাকে শুনতে হবে।

রত্না বাঈ ছিলেন ওই নয়নতারারই মেয়ে। নিজে যে কাজ করতে পারলেন না নয়নতারা, ভবেশ রায় রত্না বাঈএর প্রেমে পড়াতে সেই কাজের ভার দিয়ে গেলেন তিনি মেয়ের ওপর। মরবার সময় তিনি মেয়েকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যেমন করে হোক ভবেশ রায় আর দেবেশ রায়ের সংসারে যেন সে আগুন লাগায়।

রত্না বাঈও সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে ওঁদের জমিদারিতে গিয়েছিলেন। আগুনও লাগালেন। কিন্তু আগুনের আলোতে রত্না বাঈ দেখলেন, তিনি পুরুষ নন, নারী। অভিনয় করতে গিয়ে ভবেশ রায়কে তিনি সত্যি ভালবেসে ফেলেছিলেন। নিজের প্রিয়তমের সর্বনাশ দেখতে না পেরে বোধ হয় চোরের মত সে রাত্রে সেখান থেকে তিনি যান পালিয়ে বেনারসে। আর বাঙলা মুল্লুকে কখনও ফেরেননি। ছেড়ে দিয়েছিলেন বাঈজী-বৃত্তি। নিজের সারেঙ্গীওয়ালাকে বিয়ে করে তিনি ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন নিজের অতীত জীবনকে। কিন্তু

ভুলতে তিনি কোনদিনই পারেননি। কারণ, রামনাথ, রত্না বাঈএর সারেঙ্গীওয়ালা, প্রাণপণ চেষ্টায় রত্না বাঈকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল তার পূর্বজীবনে।

ফলে যা হবার তাই হলো। রত্না বাঈ ছাড়লেন রামনাথের সঙ্গ।

এর কিছু আগে রত্না বাঈএর একটি মেয়ে জন্মায়, নাম তার যমুনা।

রত্না, বাঈজী হলেও নারী। তাই নারীর মনও তাঁর ছিল।

যেদিন তিনি খবর পেলেন ভবেশ রায় মারা গেছেন, সেই দিন থেকে তিনি পরলেন বিধবার বেশ। যদিও রামনাথ তখনও বেঁচে।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করবার ছিল এখানে

যমুনাকে দেখতে হয়েছিল একেবারে বাঙালী মেয়ের মত।

নিজে অতবড় গায়িকা হওয়া সত্ত্বেও মেয়ে যমুনাকে তিনি গান শেখালেন না। অত্যন্ত সাধারণভাবে মানুষ করলেন।

যমুনার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্যের লোভে অনেক ছেলে তাকে বিয়ে করতেও চাইলো, কিন্তু কি জানি কেন, রত্না বাঈ কারুর সঙ্গেই নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন না।

অবশেষে যমুনার রূপে মুগ্ধ হয়ে এলো এক বাঙালী যুবক। রত্না বাঈ এবারে বিয়েতে মত দিলেন, এবং বিয়ের আগে তাঁদের পূর্ব ইতিহাস সমস্ত জানালেন তাঁর মেয়েকে। শুধু মেয়েকে নয়, ভাবী জামাই গৌর মুস্তাফীকেও সব কথা জানিয়েছিলেন। সব জেনেও গৌর মুস্তাফী যমুনাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন।

হিন্দুমতে তাঁদের বিয়ে হয়। বাঙলা মুলুকে চলে আসবার সময় রত্না অনেক উপদেশ দেন যমুনা বাঈকে। শেষকালে বলেন—. জমিদার ভবেশ রায়ের বংশের ওপর লক্ষ রাখতে। যে আগুন তিনি নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন তাঁদের বংশের মধ্যে, তাতে যমুনার কোন মেয়ে গিয়ে আর যেন আগুন না লাগায়।

গৌর মুস্তাফী ছিলেন কাটোয়ার জমিদার। কিন্তু একটা জায়গায় তিনি রত্না বাঈকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন, সেটা হলো, তিনি অবিবাহিত।

যমুনা কাটোয়ায় তাঁর জমিদারিতে এসে জানতে পারলেন, গৌরের বহুদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। গৌর তাঁকে ভোগ করতে চেয়েছিলেন, স্ত্রীর সম্মান দিতে চাননি। এক্ষেত্রে য ঘটবার তাই ঘটলো। যমুনা ছাড়লেন গৌরের সঙ্গ, চলে এলেন কোলকাতায়। তখন তিনি পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। অবশ্য আসবার সময় গৌর সঙ্গে লোক দিয়েছিলেন।

যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে রত্না বাঈ কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। সেই সময় একটা মিশনারী স্কুলে কিছুদিন পড়বার সুযোগ যমুনার হয়েছিল। তা ছাড়া মেয়ের লেখাপড়ার জন্যে রত্না বাঈ খরচাও করেছিলেন প্রচুর। পরে যমুনা লেখাপড়াকে ভালবাসতেও শিখেছিলেন।

কোলকাতায় আসার পর একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিতে তাঁর দেরি হয়নি। সম্বন্ধ চুকে গেলেও গৌর ছাড়া আর অন্য কোন পুরুষকে যমুনা নিজের জীবনে স্থান দেননি।

কাটোয়া থেকে গৌর যখন কোলকাতায় আসতেন তখন যমুনার সঙ্গে দেখাও করতেন। অর্থের প্রাচুর্য আর কোনদিনই আকর্ষণ করতে পারেনি যমুনাকে। শেষের দিনগুলো তিনি কাটিয়েছিলেন একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত।

যমুনার একটি মেয়ে হয়, নাম তার সরস্বতী। সরস্বতীকে কিছুদূর লেখাপড়া শিখিয়ে যমুনা তার বিয়ে দেন কোলকাতার একটি সামান্য ঘরে।

ছেলেটি অফিসের সামান্য কেরানী ছিল। নাম তার কল্যাণ বোস।

মৃত্যুর সময় যমুনা সরস্বতীকে কাছে ডেকে, রত্না বাঈএর দেওয়া একছড়া মুক্তোর মালা, যেটা তিনি পেয়েছিলেন ভবেশ রায়ের কাছ

থেকে, মেয়ের হাতে তুলে দেন। আর সেই সঙ্গেই মেয়েকে বারণ করে দেন যেন তাঁর কোন মেয়ে ওই রায়বংশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন না করে।

সরস্বতীর ছিল তিন মেয়ে আর এক ছেলে। সুখেই তাঁর জীবন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রের কলেরায় তাঁর সাজানো সংসার ফেলে তাঁকে চলে যেতে হয়।

মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর বড়মেয়েকে ডেকে সংসারের ভার দিয়ে যান। আর বলে যান ওই ভবেশ রায়ের মুক্তোর মালার কাহিনী।—

এই পর্যন্ত বলে বাসন্তীদি চুপ করলেন। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন—

আমি সত্যি কথা বলছি সুরেশ, আমি না জেনে তখন নিরঞ্জনের দিকে হাত বাড়িয়েছি। রম্ভা বাঈ যে আগুন লাগিয়েছিলেন, ভাগ্য-বিপর্যয়ে আমি সেই বংশকে ধ্বংস করতে বসেছিলাম। এখন উপায়? 'নিরুকে রক্ষা করতেই হবে' এই ভেবে আমি সেদিন দিলাম কলেজ ছেড়ে। ওকে চোখের ওপর দেখলে কি জানি যদি নিজেকে না ঠিক রাখতে পারি! আমার নিশ্বাসে যে বিষ আছে। তাতে যে নিরুর ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কলেজ ছেড়ে করবোটা কি?

বাবা বিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু বিয়ে করা তো আর সম্ভব নয়! মনপ্রাণ যে সর্বস্ব একজনকে দিয়ে বসেছি। এখন সেই জিনিস অপরকে দিই কি করে? যে ফুলে একবার দেবতার পূজা হয়েছে সেই ফুল ধুয়ে আর অন্য দেবতার পূজা তো চলে না। এখন আমার উপায়?

নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো। ভাবলাম অজ্ঞাতে যে পাপ করে ফেলেছি জ্ঞানে সে পাপ আর করব না। কিন্তু মন বশ মানে কই!

অশান্ত মনকে শান্ত করতে আমি নিলাম এক সন্ন্যাসীর কাছে

আশ্রয়। তিনি আমায় শেখালেন গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ি, ঘরদোর, যা কিছু দেখছি সব কিছুই হচ্ছে সেই সত্যসুন্দরেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষকে সেবা দিয়ে ভালবাসলে মনের সব কালিমা দূর হয়। তাইতো আমি এলাম এই পথে।

আমার অন্য দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই, বাবা কেউই আজ আর বেঁচে নেই। তাই এই—

বাসন্তীদি চুপ করলেন।

আমি বলি—আচ্ছা দিদি, একটা প্রশ্ন করব?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে তিনি বলেন—কর।

—আপনি কেন নিরঞ্জনকে ভালবাসলেন? নিরঞ্জন দেখতে পেত না বলে, ডাঃ ঘোষের ডায়েরীতে আক্ষেপ করেছে। তার মা, স্ত্রী, সকলেই বিপক্ষে গেছে। কিন্তু আপনি—

কথাটা লজ্জায় আমি আর শেষ করতে পারি না।

বাসন্তীদি বলেন—প্রশ্নটা আমারও মনে অনেকবার হয়েছে। তবে কি জান, ভালবাসা বোধ হয় এমনিই এক জিনিস! বোধ হয় মানুষের মনে সে বন্যার জলের মত আসে, তখন মানুষ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না।

জল নেমে গেলে মানুষ যেমন বুঝতে পারে, বন্যা কোথায় তার চিহ্ন রেখে গেছে, ঠিক তেমনি ভালবাসার বেগ। প্রকৃতিস্থ হলে সে দেখে তার মনের দু'পাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, নিজস্ব সত্তা বলতে বুঝি কিছুই নেই। আমার জীবন দিয়েই দেখ না, নিরঞ্জনকে যখন ভালবাসলাম, তখন একদিনও তাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। যদি সে কোন কারণে কোলকাতার বাইরে যেত, সারা দুনিয়া যেন আমাকে গিলে খেতে আসতো। আমি ভালবাসিনি নিরঞ্জনের অর্থকে, ভালবেসেছিলাম তার প্রতিভাকে। ভাবতাম, ওর গান শুনে, ওর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে আমি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। আমি

গরিব বলে যদি ওর বাবা-মা আমার সঙ্গে বিয়ে না দেন, তাতেও ক্ষতি নেই। দূর থেকে ওকে চোখে দেখে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেব। কিন্তু মায়ের মুখ থেকে যেদিন মুক্তোর মালার ইতিহাস জানতে পারলাম সেদিন থেকে ঠিক করলাম সভাসমিতিতে ছাড়া ওকে আর চোখেও দেখব না।

আমার মনের মধ্যে ওর যে ছবি আঁকা আছে তারই ধ্যান করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব।

মনে ভাবা যায় অনেক কিছু কিন্তু কাজে করা বড় শক্ত। তাইতো যেদিন খবর পেলাম ও অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে, ওর রোগশয্যার পাশে এমন কেউ নেই যে ওকে ভালবেসে সেবা করে, সেদিন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। দুনিয়া জানবে আমি পয়সার জন্যে সেরাত্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান জানেন, আমি গিয়েছিলাম অন্তরেরই টানে। আমি ভাবতেও পারিনি এমনটি ঘটবে। ও আমাকে চিনতে পারলো। জ্বরের ঝোঁকে খাট থেকে পড়েও গেল। কে জানে তার সেই লাগাই কাল হলো কিনা। চোখের ওপর তাকে তিল তিল করে মরতে দেখেছি। মন আমার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তবুও তার ঘরে যাইনি। তার সাক্ষী তুমিই আছ।

হ্যাঁ, কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। আমি তোমার খাবার দিতে বলি।—কথা শেষ করে তিনি চলে যান বাড়ির ভেতর।

আমি চুপচাপ সোফার ওপর গা এলিয়ে দিই। ভাবতে থাকি কি অদ্ভুত মানুষের ভাগ্য। নিরঞ্জন কোনদিন জানতেও পারলো না বাসন্তী তাকে কতখানি ভালবেসেছিল। আর বাসন্তী, তার পবিত্র ভালবাসার তুলনা বুঝি এ যুগে মেলা ভার। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্যয়! কোথায় শংকর রায় করলেন ভবিষ্যদ্বাণী, নয়নতারা তাঁকে দিলেন অভিশাপ, আর তাতে প্রায়শ্চিত্ত করলো দুটি নিষ্কলুষ

প্রাণ। তারা পরস্পরকে চেয়েও পেল না। তাদের ত্যাগের কথাও কেউ জানতে পারলো না। হয়তো এদের ভাগ্যে এমনই ঘটতো। কিন্তু কোথা থেকে এরা দুজনেই হলো শংকর রায় আর নয়নতারার বংশধর! এদের পবিত্র ভালবাসা পারলো না এদের রক্ষা করতে!